ফর রহমান রিটন
বাংলাদেশের
স্বাধীনতা
সংগ্রামের
ইতিহাস

কিশোর-তরুণদের জন্যে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

গ্রন্থে ব্যবহৃত বেশিরভাগ আলোকচিত্র 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' 'ঢাকা ১৯৪৮–১৯৭১' এবং
'মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র' এ্যালবাম থেকে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

লুৎফর রহমান রিটন

সময় প্রকাশন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

লুৎফর রহমান রিটন

সময়

সময় ৩৯

প্রচ্ছদ।। কাইয়ুম চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

প্রকাশক।। ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
২০ শেখ সাহেব বাজার রোড আজিমপুর ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস।। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ ময়মনসিংহ সড়ক ঢাকা ১০০০

স্বত্ব।। শার্লি রহমান

মূল্য।। ষাট টাকা

ISBN 984-458-039-0

ভূমিকা

আমরা বাঙালি।
বাংলা আমাদের ভাষা।
বাংলা আমাদের দেশ।

হাজার বছরের ঐতিহ্যকে লালন করে আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান আধুনিককাল পর্যন্ত অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, অনেক শাসন শোষণে রিক্ত হয়ে, অনেক রক্ত ঢেলে, অনেক জীবন বিসর্জন দিয়ে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি পেয়েছি আমরা। সুদূর অতীতে গৌরব করার মতো তেমন কিছু আমাদের না থাকলেও নিকট অতীতে বেশ কয়েকটি গৌরবময় অধ্যায় হিরন্ময় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত করেছে আমাদের ইতিহাসকে।

তেমনি একটি গৌরবময় অধ্যায়—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়। শত বছরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে, সুদীর্ঘ সংগ্রামের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি ১৯৭১ সালে।

এই প্রজন্মের প্রতিনিধির কাছে আমি বলতে চাই আমাদের সেই গৌরবের কথা। বলতে চাই আমাদের অহংকারের কথা।

পরাজিত শত্রুদের উত্থান রহিত করতে হলে অতীতের গৌরব গাঁথাকে তুলে ধরতে হবে এই প্রজন্মের সামনে।

যে জাতি নিজের অতীত জানেনা, সে বড় দুর্ভাগা জাতি।

আমি চাই আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হোক। ঘৃণা করতে শিখুক। প্রতিরোধ করতে শিখুক।

ষোল খণ্ডে বিশাল আকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। একজন কিশোর কিংবা সদ্য তরুণ পাঠকের পক্ষে এতো বিশাল আয়োজন থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সংগ্রহ করে ইতিহাস জানা খুবই কঠিন। বই এর আকার দেখে ভীত হয়ে ইতিহাসের স্পর্শ থেকে দূরে থাকলে কিশোর-তরুণেরা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। ওদের জন্যে তাই আমার এই আয়োজন—বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, তবে খুব ছোট্ট পরিসরে।

বইটির পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে সহায়তা করেছে স্নেহভাজন মাহবুব রেজা। তবে আমি সবচে বেশি ঋণী আমার অগ্রজ লেখকদের কাছে, যাঁদের মূল্যবান রচনা থেকে আমি গ্রন্থনা করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

লুৎফর রহমান রিটন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
১২ হেয়ার স্ট্রীট ওয়ারী ঢাকা ১২০৩
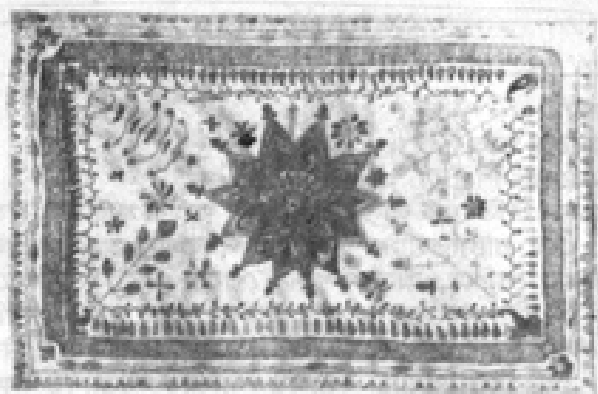
লুৎফর রহমান রিটনের আরো বই

ধুত্তুরি।। ছড়া ১৯৮২ ২য় মুদ্রণ ১৯৮৬
৮২ সালে সিকান্দার আবু জাফর সাহিত্য পুরস্কার
এবং অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

ঢাকা আমার ঢাকা।। ছড়া ১৯৮৪ ২য় মুদ্রণ ১৯৯০

উপস্থিত সুধীবৃন্দ।। ছড়া ১৯৮৪

আহসান হাবীবের ছেলেবেলা।। জীবনী ১৯৮৪

নিখোঁজ সংবাদ।। গল্প ১৯৮৬

ধূর্তবিল।। প্রবন্ধ ১৯৮৬

হিজিবিজি।। ছড়া ১৯৮৭

অন্ধকারে।। উপন্যাস ১৯৮৭

তোমার জন্য।। ছড়া কবিতা ১৯৮৯

ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ।। ছড়া কাহিনী ১৯৮৯

রাজাকারের ছড়া।। ছড়া ১৯৯০ ২য় মুদ্রণ ১৯৯০

বাংলাদেশের অগ্নিকিশোর।। শহীদ শিশুকিশোরদের কথা ১৯৯১

কাতুকুতুদের গোয়েন্দাগিরি।। রহস্যগল্প ১৯৯২

শেয়ালের পাঠশালা।। ছড়া কাহিনী ১৯৯২

ছুমটি ভামটি।। ছড়া ১৯৯২

সম্পাদিত

বাংলাদেশের নির্বাচিত ছড়া।। তিন খণ্ড ১৯৯০

ঝিলপার অনিন্দ্য।। ছোটদের বাছিকী ১৯৮৮

উৎসর্গ

প্রিয় অগ্রজ হুমায়ুন কবীর
নিত্য শুভার্থী
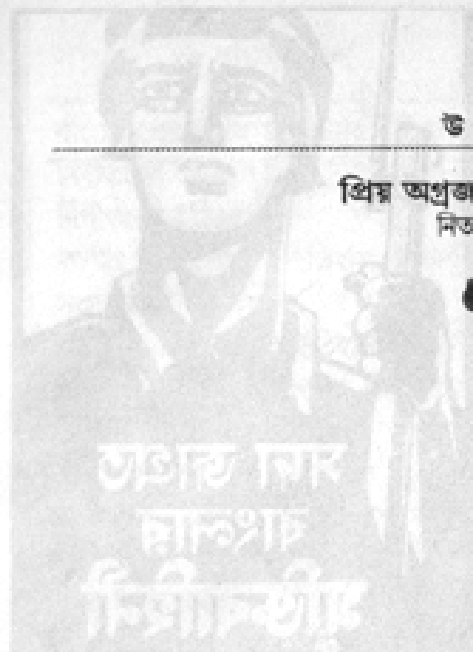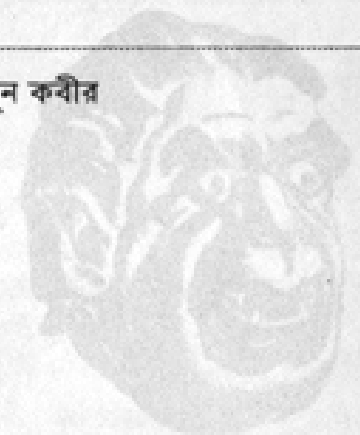
শিল্পী কামরুল হাসানের বিখ্যাত পোস্টার

মুক্তিযুদ্ধের একটি পোস্টার

বাংলাদেশের উত্তরে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ,
মেঘালয় ও আসাম প্রদেশ ;
পূর্বে ভারতের আসাম প্রদেশ,
ত্রিপুরা রাজ্য ও বার্মা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
১৯৪৭ সালে বিভক্ত হওয়ার আগে
বাংলার সীমানা ছিলো,—উত্তরে হিমালয় ;
পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও বার্মা ;
পশ্চিমে বিহার, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
বাংলাদেশের আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল।
বা ১,৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার।
বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় বারো কোটি।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো
সাড়ে সাত কোটি।

বাঙালি ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস।
নির্যাতনের ইতিহাস।
নিপীড়নের ইতিহাস।
ষড়যন্ত্র আর শোষণের ইতিহাস। বিদেশী শাসন এবং গোলামীর ইতিহাস।
সংগ্রামের ইতিহাস।
ব্যর্থতা আর গৌরবের ইতিহাস।

তুর্কী-মোঘলরা এই বাংলাকে শাসন করেছে পাঁচশো বছর। ইংরেজরা শাসন করেছে প্রায় দুশো বছর। চব্বিশ বছর শাসন করেছে পাকিস্তানীরা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিশেবে আত্মপ্রকাশ করেছে পৃথিবীর মানচিত্রে। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ক্রমবিকাশের ধারায় বাঙালি আর বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

কারো মতে বাঙালি কর্মবিমুখ, অলস।
কারো মতে বাঙালি সাহসী, কর্মঠ।
কেউ বলেন, বাঙালি সুবিধেবাদী। ভীতু।
কেউ বলেন, বাঙালি সংগ্রামশীল, প্রতিবাদী। যদিও দরিদ্র।

মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, অদৃষ্টবাদী, অকৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাসঘাতক বলেও কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন বাঙালি জাতিকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাঙালি জাতি লড়াকু জাতি।

একদিকে বাঙালির রয়েছে গোলামীর দীর্ঘ অধ্যায়, অন্যদিকে সংগ্রামী ঐতিহ্য। তবে শত শত বছর ধরে বিদেশী শাসন ও শোষণে পরাধীন জীবনযাপনে বাধ্য ছিলো বলে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পায়নি বাঙালি।

শংকর বা মিশ্র জাতি বলেই বাঙালির কপালে জুটেছে একই সংগে এতগুলো বিশেষণ। নিগ্রো, অষ্ট্রিক, মোঙ্গলীয় এবং আর্যদের মিশ্রণে বাঙালি একাকার। যে কারণে একজন বাঙালি কালো তো অন্যজন ফর্সা। একজন বেঁটে তো অন্যজন লম্বা। একজনের মাথা গোলাকৃতি তো অন্যজনের লম্বাকৃতি। চোখ পুরোপুরি কালোও নয়, আবার বাদামীও নয়। নাকটা পুরোপুরি চ্যাপ্টাও নয়, আবার টিকালোও নয়। একজনের টিকালো তো অন্যজনের চ্যাপ্টা।

এর কারণ হচ্ছে—বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তি এবং ব্যক্তি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই উর্বর ভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। এই

ভূখণ্ডের মানুষদের ওপর অত্যাচার করেছে। দখল করেছে জমি। দখল করেছে নারী। লুটে নিয়েছে সম্পদ। লুণ্ঠন করেছে সম্ভ্রম।
হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন জনপ্রবাহ বা জনগোষ্ঠীর আধিপত্য, দ্বন্দ্ব, নির্যাতন, নিপীড়ন আর মিলনে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি আর বাংলাদেশ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতি ক্রমশঃ এগিয়েছে একটি পরিপূর্ণ অবয়ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে।

নদী ঃ সভ্যতার জননী

বর্তমান বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ক্রমবিকাশের ধারায়।
নদীমাতৃক দেশ এই বাংলাদেশ।
নদী হচ্ছে সভ্যতার জননী।
পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিলো সিন্ধু, নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, ইয়াংসিকিয়াং নামের নদীকে কেন্দ্র করেই।
বাংলাদেশকে লতার মতো জড়িয়ে রেখেছে শত শত নদ-নদী। এই জনপদের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ আর সংগ্রামের প্রতীক হয়ে আছে নদী। এই জনপদের মানুষদের মানসগঠনে বিশাল ভূমিকা রয়েছে নদীর।
আবহমান বাংলার প্রকৃতি কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত। প্রকৃতির রুদ্ররোষের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় এই জনপদের মানুষদের। পদ্মা, মেঘনা, গঙ্গা, যমুনার সংগে এই জনপদের মানুষের সখ্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই।
নদী ভাঙে।
ভাঙে জনপদ। নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।'
ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় মানুষ। ভেসে যায় ঘরবাড়ি। জনপদ হয় বিরাণভূমি।
এবং জলোচ্ছ্বাসের পর, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর, এই জনপদের মানুষেরা আবারো নতুন করে ঘর বাঁধে। স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকার। প্রকৃতির রুদ্ররোষের বিরুদ্ধে এই জনপদের মানুষেরা রুখে দাঁড়ায় বারবার। প্রতিবার। এই জনপদের মানুষকে সংগ্রামশীল আর জীবনমুখী করেছে নদী।
নদীর কাছেই ভাঙতে শিখেছে মানুষ।

নদীর কাছেই গড়তে শিখেছে মানুষ।
ভাঙাগড়ার এই ধারাবাহিকতা এই জনপদের মানুষকে শিখিয়েছে—বিজাতীয় শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। প্রতিরোধ করতে। কবি তাই দরদ মিশিয়ে লিখেছেন—"এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা-সুরমা নদী তটে, আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়, কতো আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ সংকটে।"
'বাংলাদেশ গড়লো যাঁরা' গ্রন্থে সিরাজউদ্দীন আহমেদ বলেছেন—"বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে বাংলার অসংখ্য ছোটবড় নদ-নদী। নদী যুগে যুগে বাংলাকে গড়েছে। বাংলার সভ্যতা, জনপদ ও রাজধানী গড়ে উঠেছে নদীর তীরে। বায়ুমণ্ডলের চাপে হিমালয় পর্বত সাগর থেকে সৃষ্টি হয় এবং হিমালয় পাদদেশ পর্যন্ত পানিতে নিমজ্জিত ছিলো। তারপর গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী দ্বারা বাহিত পলিমাটি, বালি প্রভৃতি জমে জমে বাংলাদেশের ভূ-ভাগ সৃষ্টি হয়। ..... গঙ্গা নদীর মোহনায় দ্বীপের সৃষ্টি হয়ে বিরাট ভূ-খণ্ড সৃষ্টি হয়। দ্বীপগুলো শতধাবিভক্ত ছিলো। দক্ষিণের দ্বীপগুলো সুন্দরবনে আবৃত ছিলো। কালক্রমে নদীগুলো ভরাট হয়ে দ্বীপগুলো একত্রিত হয়েছে।"
এই জনপদের মানুষদের সুখ-দুঃখ আর হাসি-কান্নার সংগে মিশে আছে নদী, এভাবেই।
নদী জড়িয়ে রেখেছে।
নদী জড়িয়ে থেকেছে।

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি

নতুন পাথরের যুগে বাংলাদেশে জনবসতির যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে অনুমান করা হয়—আদিম অধিবাসীরা শিকারী জীবন ছেড়ে শুরু করেছিলো কৃষিকাজ। কারণ ভূমি ছিলো উর্বর। মাছ আর ভাতের সংস্থান হয়ে যেতো সহজেই। জীবিকার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো না। কৃষি জীবনের আগে এদেশে আদিম অধিবাসী ছিলো নিগ্রো প্রতিম নামে এক জাতি। অস্ট্রিকদের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে তারা। নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা—এই নিগ্রোদের পর বাংলার প্রবীণতম অধিবাসীরা ছিলেন অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতি বা অস্ট্রিক। অস্ট্রিকরা ছিলেন অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ। তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন ইন্দোচীন হয়ে। কোল, ভিল, সাঁওতাল, ভেজ্জিডরা ছিলেন অস্ট্রিকদের বংশধর। তারা কথা বলতেন অস্ট্রিক ভাষায় আর করতেন কৃষিকাজ। এদেশে কৃষি কাজের সূচনা অস্ট্রিকদের হাতেই।

অস্ট্রিকরা এদেশে এসেছিলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তাদের পর বাংলাদেশে আসেন মোঙ্গলীয় এবং দ্রাবিড়রা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে তিব্বত ও ইন্দোচীন থেকে ভাগ্যের অন্বেষণেই তারা এদেশে এসেছিলেন। এরপর আসেন আলপাইন জনগোষ্ঠী। তারা আসেন পামীর মালভূমি অঞ্চল থেকে। তাদের সঙ্গে অস্ট্রিক ও মোঙ্গলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে দ্রাবিড় জাতির একটি অংশ আশ্রয় নেয় বঙ্গে। তাদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে অস্ট্রিক ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর। আর্যরা বঙ্গে আসেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে। মৌর্য ও গুপ্ত শাসন আমলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের প্রভাব দেখা যায় বাংলাদেশে। আর্যরা বাঙালি সমাজ জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। আর তাই, মিলিত জনগোষ্ঠীর এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। জনগোষ্ঠীর রক্তে আর বিশুদ্ধতা থাকেনা। জনগোষ্ঠীর রক্তে অস্ট্রিক, মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড়, আর্য, তুর্কী, পাঠান, মোগল, ইরানী রক্ত মিশে একাকার হয়। সমন্বিত এই জনগোষ্ঠীর নাম—বাঙালি।

মহাভারতে একটি গল্প আছে। বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারত প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে রচিত বলে অনুমান করা হয়। মহাভারতের সেই গল্পে বলা হয়েছে—বলি রাজা নামে এক রাজা ছিলেন। বলিরাজা ছিলেন নিঃসন্তান। দৈত্যরাজ বলিরাজার স্ত্রী অর্থাৎ রাণী ছিলেন সুদেষ্ণা। ঋষী দীর্ঘতমার ঔরষে সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। সন্ন্যাসী দীর্ঘতমা সুদেষ্ণাকে বর দিয়েছিলেন এই বলে যে—বিভিন্ন রাজ্যের নামকরণ করা হবে তার সন্তানদের নামে। পরবর্তীতে হয়েছিলো তাই। অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্র দেশ, সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ এবং বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ-এর নামকরণ করা হয়েছিলো। মহাভারতের এই গল্পকে সত্যি বলে মেনে না নিলেও একথা সত্যি যে, এই পাঁচ নামে পাঁচটি জনপদ প্রাচীনকালে ছিলো।

বাঙ বা বঙ্গজাতি সৃষ্টি বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে অনুমান করা হয় চার হাজার বছর আগে বাঙ জনপদ বা বঙ্গজনপদ গড়ে ওঠে। মহাভারতে কথিত আছে যে দীর্ঘতমা ১৬০০ খৃষ্টপূর্বে জীবিত ছিলেন। তার মানে, ৩৬০০ বছর আগে গড়ে ওঠে বাঙ জাতি। মহাভারতের গল্পটি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও মহাভারতে বঙ্গের উল্লেখ বাঙালি জাতির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়।

বাঙ শব্দটির অর্থ জলাভূমি। অনেকের মতে বাঙ চীন-তিব্বতীয়-মোঙ্গলীয় শব্দ। জলাভূমিতে যারা বাস করতো তাদের বলা হতো বাঙ বা বঙ্গ জনগোষ্ঠী। মহাভারতে বলা হয়েছে—বাঙ জাতি ম্লেচ্ছ, পক্ষী সদৃশ। তারা অসুর জাতি। তাদের দেশ পাণ্ডব বিবর্জিত। পাণ্ডব অর্থাৎ সভ্যজাতি বঙ্গদেশে বাস করে না। এই বাঙ জাতি পূর্বদিক বা ইন্দোচীন থেকে এসে গঙ্গায় বদ্বীপ এলাকায় বসতি স্থাপন করে

এবং তাদের নামেই জনপদের নাম হয় বঙ্গ। সর্বপ্রথম এদেশের নাম 'বাঙ্গাল' বলে উল্লেখ করেছেন সম্রাট আকবরের রাজসভার পণ্ডিত আবুল ফজল, তার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে।

বাঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিত আবুল ফজল বলেছেন—বঙ্গ নামের সঙ্গে জমির সীমা আল বা আইল যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন—বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আইল বা আল যুক্ত হয়ে বঙ্গ+আল=বঙ্গাল, বঙ্গাল থেকে ঘিরে ঘিরে বাঙ্গাল, তারপর বাঙ্গাল থেকে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালা থেকে 'বাংলা' শব্দের জন্ম হয়েছে।

বাঙ জাতি জমির সীমা নির্ধারণ এবং ঝড়বৃষ্টি বন্যা ও লবণাক্ততা থেকে রক্ষার জন্যে আল বা আইল, অন্য কথায় বাধ নির্মাণ করতো। বাঙ জাতির সঙ্গে প্রাচীন অষ্ট্রিক, আলপাইন, দ্রাবিড় ও আর্যদের সংমিশ্রণ ঘটে এবং চার জনগোষ্ঠী মিলে সৃষ্টি হয় বাঙ্গাল জাতির।

প্রাচীন কাল থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ বিভিন্নভাগে বিভক্ত ছিলো। একেকটি গোষ্ঠীকে প্রাচীনকালে বলা হতো কৌম। কৌম বা জনগোষ্ঠীর নাম অনুসারে জনপদের নামকরণ হয়েছে। যেমন বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্র, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ। বরিশাল থেকে সিলেট পর্যন্ত জনপদকে বলা হতো চন্দ্রদ্বীপ। এক সময় পুরো পূর্ব বাংলাকেই বলা হতো সমতট জনপদ। বগুড়া দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চল ছিলো পুণ্ড্রবর্ধন জনপদ। এই অঞ্চলের আরেকটি নাম ছিলো বরেন্দ্র। বর্ধমান হুগলী হাওড়া অঞ্চল মিলে ছিলো রাঢ় জনপদ। এক সময় সমগ্র বাংলাদেশের নাম ছিলো গৌড়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা ছিলো। এক জনপদের সঙ্গে অন্য জনপদের যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিলো ভাষা। ভাষা হচ্ছে সামাজিক বন্ধন। ঐতিহাসিক কারণেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাব-বিনিময় চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সপ্তম শতকে সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষা। বাঙ জাতির ভাষা ছিলো বাংলা ভাষা। বাঙ বা বাঙ্গাল জাতির ভাষার সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষার মিশ্রণ ঘটে। মিশ্রিত সেই ভাষায় বাঙ্গালদের ভাষার প্রাধান্য ছিলো বলেই ভাষার নাম হয় বাংলা ভাষা।

খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর দক্ষিণে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে এক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে অনুমান করা হয়—সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাংলাদেশে বাস করতো একটি সুসভ্য জাতি।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তখনকার ইতিহাসে বাংলাদেশে গঙ্গারিডি নামের একটি রাজ্যের উল্লেখ আছে।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন। এসময় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয় মৌর্য সাম্রাজ্যের। সম্রাট অশোকের অধীনে বঙ্গ ছিলো একটি প্রদেশ। চতুর্থ শতকে বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন চন্দ্রবর্মা। মৌর্যদের পরে বাংলাদেশ ছিলো গুপ্ত রাজাদের অধীনে। ধারণা করা হয় সমুদ্রগুপ্তের পিতা চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গ জয় করেন। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড় এবং রাঢ় অঞ্চল নিয়ে প্রথমবার স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ শাসন করেন হর্ষবর্ধন। অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশ ছিলো অরাজকতায় পূর্ণ। ৭৫০ সনে রাজা নির্বাচিত হন গোপাল। পাল বংশের চারশো বছরের শাসন বিশেষ অবদান রেখেছে বর্তমান বাংলাদেশ বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষার গোড়াপত্তনের ক্ষেত্রে।

পাল বংশের পর সেন বংশ ১০৯৮ সন থেকে ১২০৩ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। এ সময় বাংলাদেশ রাঢ় গৌড় বঙ্গ বাগড়ি এবং নাব্য মণ্ডল নামের পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলো। সেনদের রাজভাষা ছিলো সংস্কৃত। সেনদের শাসন আমলে বাঙালিদের ওপর সংস্কৃত ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে। কিন্তু বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে পরিত্যাগ করে সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করেনি।

তুর্কীরা বাংলাদেশ দখল করে নেয় ১২০৩ সালে। কথিত আছে তুর্কী বীর ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার রাজধানী গৌড়ে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে আক্রমণ করে মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সহযোদ্ধা নিয়ে বঙ্গ জয় করেন। আসলে ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য লক্ষ্মণ সেনের পুরীতে প্রবেশ করেছিলো অতর্কিতে, বাইরে অপেক্ষা করছিলো বখতিয়ার খলজীর বিশাল বাহিনী। মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সাহস ও শক্তি লক্ষ্মণ সেনের ছিলোনা। ৮০ বছরের বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন তাই পালিয়ে গিয়েছিলেন। নিপীড়িত বাঙালি জনগোষ্ঠী মুসলিম শাসনকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অনেকে ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছিলেন তখন। অনেক তুর্কী আফগান এবং আরব মুসলমান বসতি স্থাপন করেন বাংলায়। ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন বহু পীর-দরবেশ। নিপীড়িত বাঙালিরা মুসলিম শাসনের সংস্পর্শে এসে যেনো নতুন জীবন ফিরে পেলেন। নতুন জীবনপ্রাপ্ত বাঙালিদের সহায়তায় গৌড়ের সুলতানেরা দিল্লীর অধীনতা অমান্য করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দিল্লীর মুসলমানদের শাসন আমলে বাংলার সুলতানেরা বারবার বিদ্রোহ করেছেন। ফলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বাংলাকে আখ্যা দিয়েছেন বিদ্রোহ নগর বলে। গৌড়ের সুলতান তুঘরীল খান ১২৭৮ সনে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবন তাকে সদলবলে হত্যা করেন। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন ১৩৪২ সনে।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ সনে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্ব বঙ্গকে একত্রিত করে সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি হন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহই সর্বপ্রথম খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন জনপদ ও রাজ্য একত্রিত করে বিশাল স্বাধীন বাংলা গঠন করেন এবং 'শাহ বাঙ্গাল' উপাধি ধারণ করেন। সুলতান হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন ১৪৯৩ সনে। সুলতান হোসেন শাহ-এর আমলে বাংলাভাষা সমৃদ্ধির উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো। সুলতানেরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশে এসে উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশ শাসন করতে হলে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হবে। আপন করে কাছে টেনে নিতে হবে এদেশের মানুষকে। বাংলা ভাষাকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এবং বাঙালি জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদান রেখেছেন তারা।

মোঘল সম্রাট বাবর পাঠানদের পরাজিত করে দিল্লী দখল করেন ১৫২৬ সনে। মোঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে পাঠানরা দলে দলে বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন। এবার বাঙালি রক্তের সংগে মিশ্রণ ঘটলো পাঠান রক্তের। স্বাধীনভাবে 'বারো ভূঁইয়া' বাংলাদেশ শাসন করেন ১৫৭৫ সন থেকে ১৬১১ সন পর্যন্ত। বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে ঈশা খান, প্রতাপাদিত্য, রামচন্দ্র, চাঁদ রায়, কেদার রায় বাংলার স্বাধীনতার জন্যে মোঘল সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১১ সনে বারো ভূঁইয়াদের পরাজিত করে দখল করে নেন সমগ্র বাংলা। বিহার-উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলাকে যুক্ত করে একটি প্রদেশ বা সুবা গঠন করা হয়। সুবার রাজধানী ছিলো ঢাকায়। বাংলা শাসন করতো একজন সুবাদার।

মগ-পর্তুগীজরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে সম্রাট শাহজাহানের আমলে। মগ-পর্তুগীজদের আক্রমণের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জনবসতি শূন্য হয়ে পড়ে। সুবাদার শায়েস্তা খান মগ-পর্তুগীজদের কঠোর হস্তে দমন করেন ১৬৬৬ সনে। ১৭১৭ সনে মুর্শিদকুলী খাঁ রাজধানীকে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেন। নবাব আলিবর্দী খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহন করেন ১৭৪০ সনে। মোঘল সম্রাটকে নামমাত্র কর দিয়ে আলিবর্দী খান রাজ্য শাসন করতেন স্বাধীনভাবে। আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সনে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহন করেন সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন আলিবর্দী খানের দৌহিত্র বা নাতি।

বাঙালি ঃ হাজার বছর আগে

কেমন ছিলো হাজার বছর আগের বাঙালি? কেমন ছিলো তাদের পোশাক-আশাক, চাল-চলন আর জীবন-যাপন পদ্ধতি?

বাঙালির আজকের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন বাঙালির সংস্কৃতির সাদৃশ্য ছিলো কতটুকু? ডঃ আনিসুজ্জামান লিখেছেন— "হাজার বছর আগে পুরুষেরাই পরতো ধুতি, সব মেয়েরাই শাড়ি। শুধু সচ্ছল অবস্থা যাদের, তাদের বাড়ির ছেলেরা ধুতির সঙ্গে চাদর পরতো, মেয়েরা শাড়ির সঙ্গে ওড়না ব্যবহার করতো। এখনকার মতো তখনো মেয়েরা আঁচল টেনে ঘোমটা দিতো, শুধু ওড়নাওয়ালীরা ঘোমটা দিতো ওড়না টেনে। তবে ধুতি আর শাড়ি দুই-ই হতো হাতে-বহরে ছোট। তাতে নানারকম নক্সাও কাটা হতো। মখমলের কাপড় পরতো শুধু মেয়েরা। নানারকম সূক্ষ্ম পাটের ও সুতোর কাপড়ের চল ছিল। জুতো পরতে পেত না সাধারণ লোকে, শুধু যোদ্ধা বা পাহারাদাররা জুতো ব্যবহার করতো। সাধারণে পরতো কাঠের খড়ম। ছাতা-লাঠির ব্যবহার ছিলো। সাজসজ্জার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল প্রাচীন বাঙালির। চুলের বাহার ছিল দেখবার মতো। বাবড়ি রাখত ছেলেরা। না হয় মাথার ওপরে চূড়ো করে বাঁধত চুল। এখন মেয়েরা যেমন ফিতে বাঁধে চুলে, তখন শৌখিন পুরুষেরাও অনেকটা তেমনি করে কোঁকড়া চুল কপালের উপর রাখত। মেয়েরা নিচু করে 'খোপ্যক' বাঁধত—নয়তো উঁচু 'ঘোড়াচূড়'। কপালে টিপ দিত, পায়ে আলতা ; চোখে কাজল আর খোঁপায় ফুল। নানারকম প্রসাধনীও ব্যবহার করত তারা।

মেয়েরা তো বটেই, ছেলেরাও সে যুগে অলংকার ব্যবহার করত। সোনার অলংকার পরতে পেত শুধু বড়লোকেরা। তাদের বাড়ির ছেলেরাও সুবর্ণকুণ্ডল পরতো, মেয়েরা কানে দিত সোনার 'তরঙ্গ'। হাতে, বাহুতে, গলায়, মাথায় সর্বত্রই সোনামণিমুক্তো শোভা পেত তাদের মেয়েদের। সাধারণ পরিবারের মেয়েরা হাতে পরতো শাঁখা, কানে কচি তালপাতার মাকড়ি, গলায় ফুলের মালা।

ভাত বাঙালির বহুকালের প্রিয় খাদ্য। সরু শাদা চালের গরম ভাতের কদর সব চাইতে বেশি ছিল বলে মনে হয়। পুরোনো সাহিত্যে ভালো খাবারের নমুনা হিশেবে যে তালিকা দেয়া হয়েছে, তা এই : কলার পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, নালিতা শাক, মৌরলা মাছ আর খানিকটা দুধ। লাউ, বেগুন ইত্যাদি তরিতরকারী প্রচুর খেতো সেকালের বাঙালিরা। ইলিশ মাছ, শুটকির চল সেকালেও ছিল—বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে। ছাগমাংস সবাই খেতো—হরিণের মাংস বিয়ে-বাড়িতে বা এরকম উৎসবেই সাধারণত দেখা যেত। পাখির মাংসও তাই। সমাজের নিচু স্তরে শামুক থেকে শুরু করে গরু শুয়োর সবই খাওয়া হত। ক্ষীর, দই, পায়েশ, ছানা—এসব

ছিল বাঙালির নিত্যপ্রিয়। আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল ছিল প্রিয় ফল। আর খুব চল ছিল খাজা, মোয়া, নাড়ু, পিঠেপুলি, বাতাসা, কদমা এসবের। মশলা দেয়া পান খেতেও সকলে ভালবাসতো।

সাধারণ লোকে মাটির পাত্রেই রান্নাবান্না করতো। 'জাড়ি' (জালা), 'ভাণ্ডী' (হাঁড়ি), 'তেলা-বনী' (তেলানী)—সচরাচর এসব পাত্রের ব্যবহারই করা হত।

সেকালের পুরুষেরা ছিল শিকার-প্রিয়। কুস্তী খেলারও চল ছিল বেশ। মেয়েরা সাঁতার কাটতে ও বাগান করতে ভালবাসতো। মেয়েরা খেলতো কড়ির খেলা, ছেলেরা দাবা আর পাশা। বড়লোকরা ঘোড়া আর হাতীর খেলা দেখত। যাদের সে ক্ষমতা ছিল না, তারা ভেড়ার লড়াই আর মোরগ-মুরগীর লড়াই বাঁধিয়ে দিত।

নাচগানের বেশ প্রসার ছিল। 'সবরসিয়া' (বীণা), 'বাংশি' (বাঁশি), 'কাণ্ড' (কাড়া), 'ডমরুলি' (ছোট ডমরু), 'দাদুহি' (ঢাক)—এসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল নৌকা। হাতীর পিঠে ও ঘোড়াগাড়িতে চড়তো শুধু অবস্থাপন্ন লোকেরা। গোরুর গাড়ি সাধারণ লোকে ব্যবহার করত—তবে সব সময়ে নয়—বিশেষ উপলক্ষে। মেয়েরা 'ঢল্লরিকায়' (ডুলিতে) চড়তো, 'ঝম্পান' বা পালকির ব্যবহারও ছিল। বড় লোকদের পালকি হতো খুব সাজানো গোছানো ; রাজবাড়িতে হাতির দাঁতের পালকিও থাকত।

বেশীর ভাগ লোকই থাকত কাঠ-খড়-মাটি-বাঁশের বাড়িতে। বড় লোকেরাই শুধু ইটকাঠের বাড়ি করত।

ওপরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার বলতে হয়েছে সকলে একরকম ছিল না। কেননা, সেই পুরোনো কাল আর নেই যখন সবাই মিলেমিশে কাজ করত। রাজা এসে গেছেন সমাজে। তাই কেউ প্রভু, কেউ ভৃত্য। কেউ প্রভুর প্রভু, কেউ দাসের দাস। সংস্কৃত কবির রচনায় তাই এমন দুটো ছবি পাওয়া যায়—ছবি দুটো যে একই দেশের সেকথা মনে হয় না। একজন দিয়েছেন মেয়েদের বর্ণনা ঃ

"কপালে কাজলের টিপ, হাতে চাঁদের কিরণের মতো শাদা পদ্মবৃন্তের বালা ও তাগা, কানে কচি রীঠা ফলের দুল, স্নানস্নিগ্ধ কেশে তিলপল্লব।"

—আরেকজন এঁকেছেন সংসারের ছবি ঃ

"নিরানন্দে তার দেহ শীর্ণ, পরণে ছেঁড়া কাপড়। ক্ষুধায় চোখ আর পেট বসে গেছে শিশুদের, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে। দীন দরিদ্র গৃহিণীর গাল ভেসে যাচ্ছে অশ্রুতে। সে প্রার্থনা করছে, যেন এক মণ চালে তার এক শ' দিন চলে যায়।"

বাংলাভাষার প্রাচীন কাব্য

বাংলা ভাষার সবচে' পুরনো যে বইটি পাওয়া গেছে তার নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। সংক্ষেপে চর্যাপদ। চর্যাপদ লেখা হয়েছে পুঁথির আঙ্গিকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবারে পুঁথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন বাংলাভাষার সবচে' প্রাচীন কবিতা, প্রায় এক হাজার বছর আগে লেখা চর্যাপদ। চর্যাপদে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ বা কবিতা আছে। পদগুলো রচনা করেছেন তেইশজন বৌদ্ধ মরমী সাধক বা সহজিয়া কবি। পদগুলোতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে অনেক কথা। হাজার বছর আগের বাংলাদেশের বর্ণনা, বাঙালিদের আচার আচরণ এবং জীবন-যাপনের চিত্র ও পরিচয় চর্যাপদে পাওয়া যায়। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পদগুলো পুঁথিতে সংকলিত হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। চর্যাপদে সংকলিত পুঁথিতে বাংলা ভাষার আদিরূপ ছিলো এরকম—

কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চি এ পইঠো কাল।
দিট করি অ মহাসুহ পরিমান।
লুই ভনই গুরু পুছিঅ জান।।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সময় হচ্ছে বাংলাসাহিত্যের আদি যুগ। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হচ্ছে মধ্যযুগ। মধ্যযুগের প্রথম যে বইটি পাওয়া গেছে, সেটি একেবারেই ছেঁড়াখোঁড়া, বইয়ের নামটি পড়া যায় না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বই বলে তার নাম দেয়া হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক হচ্ছেন বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্তবড়ু চণ্ডীদাস। মধ্যযুগীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেছেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আরেকজন পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ ; ১৯১৬ সালে।

বাংলাসাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। পুরনো ঐতিহ্য বজায় থাকলেও আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে সবচে' বেশি প্রভাবিত করেছে ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি মাধ্যমে এবং সরাসরি অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যও বাংলাসাহিত্যের বিকাশ এবং শ্রী বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে যথেষ্ট।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনিশ শতকে নবজাগরণ শুরু হয়েছিলো বাংলাদেশে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী বাঙালি রেঁনেসায় অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। এই রেঁনেসা বা নবজাগরণের অন্যতম বাহন ছিলো বাংলাভাষা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ লেখকেরা

বাংলাভাষাকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গণে পরিচিত করেছেন, সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের হাতেই বাংলাভাষা অর্জন করেছে সমৃদ্ধি। হয়েছে আধুনিক।

পরাজয় ঃ পলাশীর প্রান্তরে

পাঁচশো বছর বাংলাকে শাসন করলো তুর্কী-মোঘলরা। অতঃপর ইংরেজ বণিকেরা এলো। বাণিজ্যের নামে। বললো, ব্যবসা করবো। ব্যবসা-বাণিজ্যের অজুহাতে বাংলায় এসে ইংরেজরা বিস্তার করলো তাদের ষড়যন্ত্রের জাল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

ইংরেজদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠানের ব্যানারেই ইংরেজরা শুরু করলো তাদের কর্মকাণ্ড। তারপর ধীরে ধীরে কুক্ষিগত করলো সকল ক্ষমতা। ইংরেজরা শাসন করলো প্রায় দুশো বছর। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

বাংলার ইতিহাসে ইংরেজদের ঠাঁই করে দিয়েছে এদেশেরই কিছু বিশ্বাসঘাতক। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। বাংলার ইতিহাসের একটি কালো দিবস। এই দিনে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিলেন। দেশটা চলে গিয়েছিলো ইংরেজদের হাতে।

মীর জাফর আলী খান ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি। ইংরেজ কোম্পানীর লর্ড ক্লাইভের সংগে গোপনে হাত মিলিয়েছিলেন মীর জাফর। লর্ড ক্লাইভ লোভ দেখিয়েছিলেন মীর জাফরকে। বলেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে তোমাকে আমরা বসাবো নবাবের সিংহাসনে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সশস্ত্র যুদ্ধে সেনাপতি মীর জাফর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এভাবেই একজন বাঙালি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত হলো বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো তার ক'দিন পরেই, ২ জুলাই। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মীর জাফর ছাড়াও জড়িত ছিলেন রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, ইয়ার লতিফ ও ঘষেটি বেগম।

সিরাজের স্থলাভিষিক্ত হলেন মীর জাফর আলী খান। নামমাত্র নবাব হলেন তিনি। ক্ষমতাহীন পুতুল নবাব মীর জাফরের হাতে কোনো ক্ষমতাই থাকলো না। সমস্ত ক্ষমতা মুঠোবন্দি হলো ইংরেজদের।

বিপরীত দৃশ্য

বীর পুরুষের অভাব ছিলো এই বাংলায়।
অভাব ছিলো সাহসী নেতৃত্বের।
অভাব ছিলো সৎ ও সত্যিকার দেশপ্রেমিকের। ১৮ শতকে যখন বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী, তখন, এদেশের শাসক শ্রেণী ছিলো সেই বিপ্লবের প্রতি উদাসীন। ইউরোপে যখন তুমুল শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি বিপ্লব চলছে, তখন দিল্লীর সম্রাটেরা ভারতে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ করে দিচ্ছে ইংরেজ বণিকদের। বাণিজ্যের এই অবাধ সুযোগ নিয়েই তারা বাণিজ্যের নামে রাজ্য দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। ইউরোপ যখন নিত্য নতুন আবিষ্কার করে সমাজ জীবনে আনছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তখন বাংলা, শুধু বাংলা নয়, পুরো ভারতবর্ষ তখন পশ্চাদমুখী, ধর্মাচ্ছন্ন। স্বাধীনতার জন্যে আমেরিকা যখন সংগ্রাম করছে, তখন বাংলার মুৎসুদ্দী শ্রেণী কেমন করে স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়া যায়—সেই ষড়যন্ত্রেই মেতে থাকে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে।

লড়াই ঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে

বাংলাদেশ ইংরেজদের অধীনে ছিলো ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই ১৯০ বছরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আটকে পড়া এদেশের মানুষেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে বহুবার। ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্যে বাংলার সাধারণ মানুষেরা বারবার বিদ্রোহ করেছে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের নাম—ফকির ও সন্ন্যাস বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত টানা চল্লিশ বছর ধরে চলেছিলো। ১৭৬৩ সালে একদল ফকির ঢাকায় ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি আক্রমণ করে তা দখল করে নিয়েছিলো। ফকির বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন মজনু শাহ। মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ আর পরাগল শাহ ছিলেন মজনু শাহ-এর শিষ্য। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এই বিদ্রোহী ফকির ও সন্ন্যাসীরা ছিলেন 'দস্যু'। ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের নামে অবাধ লুণ্ঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই ছিলো এই কথিত দস্যুদের কাজ।

১৭৯৩ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে একদল অনুগত জমিদার সৃষ্টি করা হলো। ইংরেজদের মদদপুষ্ট জমিদাররা সীমাহীন অত্যাচার শুরু করলো জনসাধারণের ওপর। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে কৃষকেরা। ১৮৩৩ সালে শেরপুরের পার্বত্য জাতি গারো এবং হাজং-রা দরবেশ করম শাহ-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়।

দরবেশ করম শাহ-এর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র টিপুর নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক বিদ্রোহ করে অত্যাচারী জমিদার এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে। ইতিহাসে এই বিদ্রোহের নাম—কৃষক বিদ্রোহ। টিপুর নাম পাগল ছিলো বলে সাধারণ মানুষের কাছে এই বিদ্রোহ পাগলপন্থী বিদ্রোহ নামেও পরিচিত ছিলো।
১৮৩১ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিলো তিতুমীরের নেতৃত্বে। ওয়াহাবী ধর্ম প্রচারক, ইসলামের বিশুদ্ধরূপের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের নেতা এবং বিধর্মী ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী সৈয়দ আহমদের শিষ্য নিসার আলী ওরফে তিতুমীর কোম্পানীরাজের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন প্রকাশ্য বিদ্রোহ। অত্যাচারী জমিদার, নীলকর ও পুলিশের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে গরীব মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ ছিলো এটি। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ক্যালকাটা মিলিশিয়া বাহিনী ওয়াহাবীদের নেতৃত্বে নারিকেলবাড়িয়ায় তৈরি করেন বাঁশের কেল্লা। কলকাতা থেকে প্রচুর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী এসে বিদ্রোহীদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজ কোম্পানী বাঁশের কেল্লা দখল করে নেয় এবং শহীদ হন তিতুমীর। তিতুমীরের মৃত্যুর পরেও ওয়াহাবী আন্দোলন ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এ সময় এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিলো ফরিদপুর। ফরিদপুরের বিদ্রোহীরা পরিচিত ছিলো 'ফরাজী' নামে। ফরাজী বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন হাজী শরিয়তউল্লাহ। হাজী শরিয়তউল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদু মিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই ফরাজীদের খুব প্রভাব পড়েছিলো পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে।
ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা যে বিদ্রোহকে 'প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থানের' মর্যাদা দিয়েছেন তার নাম সিপাহী বিদ্রোহ। পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে একটি পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করেছিলো চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা রজব আলীর নেতৃত্বে ব্যারাক ত্যাগ করে খুলে দেয় জেলখানা, লুঠ করে ট্রেজারী, আগুন দেয় অস্ত্রাগারে। চারশো বিদ্রোহী সৈনিকের মধ্যে এই বিদ্রোহে শহীদ হন তিনশো জন। বাকীরা পালিয়ে যান। ঢাকার সিপাহীরা বিদ্রোহ করেন ২২ নভেম্বর, চট্টগ্রামের চারদিন পর। লেঃ লুইসের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী লালবাগের বিদ্রোহী সিপাহীদের ঘেরাও করার চেষ্টা করলে বেঁধে যায় সংঘর্ষ, হতাহত হয় অনেকে। বিদ্রোহী সিপাহীদের অনেকেই বন্দি হন ইংরেজদের হাতে। বন্দি বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয় ভিক্টোরিয়া পার্কে, এখন যেটা বাহাদুর শাহ পার্ক। এই বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমানেরা যুদ্ধ করেছিলো একযোগে।
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সফল না হলেও এর প্রভাবে বাংলায় প্রজা বিদ্রোহ

ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো। ১৮৫৯ এবং ১৮৬০ সালে নীল-চাষীদের প্রতিরোধ তীব্রতা পেয়েছিলো। যশোর, নদীয়া এবং পাবনা জেলায় নীল চাষ বেশি হতো। এসব অঞ্চলে তাই বিদ্রোহ ছিলো চরম। কি হিন্দু কি মুসলমান, বাংলার কৃষকরা একযোগে প্রজ্জ্বলিত করেছিলো নীল বিদ্রোহের আগুন। ১৮৭২-৭৩ সালে কৃষক বিদ্রোহ তুমুল আকার ধারণ করেছিলো পাবনা বগুড়াসহ অন্যান্য জেলায়। বিশেষ করে পাবনার কৃষক বিদ্রোহটি ছিলো ভয়ংকর সহিংস। এই বিদ্রোহ ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো ইংরেজ ও জমিদারদের মধ্যে। ইংরেজ সরকার প্রবল গণ-বিদ্রোহের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বন্ধ হয় নীল চাষ।

১৮৬৮-৬৯ সালে উত্তরবঙ্গে আবারো শুরু হয়েছিলো ওয়াহাবী আন্দোলন। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। কংগ্রেস আর লীগ স্বাধীনতার পক্ষে থাকলেও সশস্ত্র যুদ্ধ করেনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে। লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পূর্ব বাংলা অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি নূতন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছিলো ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। ঢাকা হয় নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী। পাঞ্জাবের একটি অংশকে উত্তর পশ্চিম এলাকার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গঠন করা হয়েছিলো একই সময়ে। বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিলেন ঢাকার নবাব বাহাদুর স্যার সলিমউল্লাহ। চরমপন্থীদের প্রাধান্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শিগগিরই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিলো। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের পাশাপাশি 'হিন্দু মহাসভার'ও জন্ম হয়েছিলো। এই উপমহাদেশের রাজনীতি ধর্মীয় পথে, অর্থাৎ, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের পথে পরিচালিত হয় তখন থেকেই। বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ১৯০৭ সালে। জামালপুর পাবনা এবং কুমিল্লায় সংগঠিত হয়েছিলো এই দাঙ্গা। সন্ত্রাসবাদীরা ১৯০৭ সালে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দলের মাধ্যমে শুরু করে আন্দোলন, রাজনৈতিক হত্যা ও লুণ্ঠন। যুগান্তর দলের কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের অমিত সাহসী সৈনিক। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন ক্ষুদিরাম। ভুলবশত বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিলো কিংসফোর্ডের গাড়ির মতোই অন্য একটি গাড়িতে। ফলে দুজন ইউরোপীয় মহিলা নিহত হয়েছিলেন। ক্ষুদিরামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিলো ইংরেজরা ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট।

অনুশীলন সমিতির সন্ত্রাসবাদীরা কেবল ইংরেজ-বিরোধীই ছিলো না, তারা ছিলো মুসলিম-বিরোধীও। শেষ নাগাদ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সফল হয়েছিলো। ১৯১১ সালের

১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাতিল করে দেন বঙ্গভঙ্গ।

১৯১৮ সাল থেকে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিলো মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেস স্বরাজ্যের জন্যে। মওলানা মোহাম্মদ আলি এবং মওলানা শওকত আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে ১৯২০ সাল থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিলো খেলাফত আন্দোলন। ইংরেজ-বিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত ছিলো ঠিকই, কিন্তু তা সফল হয়নি। বাংলার সূর্যসন্তান সূর্যসেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে সংগঠিত হয়েছিলো সশস্ত্র বিপ্লব। সূর্যসেনের বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা। কিন্তু সফল হয়নি সূর্যসেনের বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বা বৃটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করেছিলো বিপ্লবীদের।

১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। বাংলার উদীয়মান নেতা এ কে ফজলুল হকের দল "নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি" এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে আইনসভায় ৪০টি আসন এবং মুসলিম লীগ ৩৮টি আসন লাভ করে। পরে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা সমিতি ও মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ফজলুল হক। কৃষক প্রজা সমিতির নেতা এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ দলেরও নেতা হয়ে ওঠেন আপন যোগ্যতায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা বাংলার পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের জন্যে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সময় মুসলমানদের শিক্ষার বিস্তার ঘটে। তাছাড়া প্রজাসত্ব আইন পাশ হওয়ায় এ সময় খুব উপকৃত হয়েছিলেন সাধারণ কৃষকেরা। ফজলুল হক হয়ে ওঠেন কৃষকদের প্রিয় নেতা।

লাহোর প্রস্তাব

লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্-এর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ। ২৩ মার্চ বিকেলের অধিবেশনে ফজলুল হক উপস্থিত হলে সবাই দাঁড়িয়ে তাঁকে 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে স্বাগত জানান। ফজলুল হক ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা সম্পর্কিত মুসলিম লীগের মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটিই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় পরদিন, অর্থাৎ ২৪ মার্চ। এই প্রস্তাবে ভারতের পূর্ব (বাংলা ও আসাম) এবং পশ্চিম (সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব) অঞ্চলে, অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দুটি

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিলো। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই ফজলুল হকের বিরোধ বেঁধে যায়। এই বিরোধের ফলে ফজলুল হককে অপসারণ করা হয় মুসলিম লীগ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিলো তখন। একদিকে বৃটেন, আমেরিকা আর রাশিয়া ; অন্যপক্ষে জার্মানি, ইটালি ও জাপান। যুদ্ধের সময় ভারতের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুভাষচন্দ্র বসু 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করে আসাম-মনিপুর অঞ্চলে যুদ্ধ করেন এবং ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করেন। ১৯৪২ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কুইট ইণ্ডিয়া বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। এই নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ দল বিপুলভাবে জয়ী হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ইতোমধ্যে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী শ্রমিক দল সিদ্ধান্ত নেয় ভারতকে স্বাধীনতা দেয়ার। এক বা একাধিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ছেড়ে চলে যাবে, এই ছিলো বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা। এ কাজ সমাধা করার জন্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে তখন খুব মতবিরোধ, পাকিস্তান নিয়ে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের শর্তে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র মেনে নিতে রাজী হয়। এসময় সারাদেশ জুড়ে চলছিলো হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইংরেজ সরকার ১৯৪৭ সালের ৩ জানুয়ারি ক্ষমতা

হস্তান্তরের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ আগষ্ট বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র—পাকিস্তান ও ভারতে পরিণত হয়।

অমিলের ঐক্য ঃ পাকিস্তান

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলিম লীগের পাকিস্তান এবং কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের অধীনে বাংলার স্বার্থ রক্ষিত হবে না। সোহরাওয়ার্দী তাই দাবি করলেন স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু ও কিরণ শংকর রায়ের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বঙ্গীয় আইন সভার অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট পড়ে বেশি। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিলো। সেটা আর হলোনা। ষড়যন্ত্র করা হলো। ভয়ানক ষড়যন্ত্র। ইংরেজরা দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এই উপমহাদেশকে দুটি ভাগে ভাগ করে ফেললো। এক খণ্ডের নাম হলো ভারত। অন্য খণ্ডের নাম পাকিস্তান। আরো একটি খণ্ড হবার কথা ছিলো। আলাদা খণ্ড। আলাদা নাম। বাংলাদেশ। কিন্তু মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের কারণে হলোনা।

একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো ধর্মের দোহাই পেড়ে। বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হলো। একভাগ পূর্ববঙ্গ অন্যভাগ পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ববঙ্গকে জুড়ে দেয়া হলো পাকিস্তানের সঙ্গে, আর পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে দেয়া হলো ভারতের সঙ্গে। কী অদ্ভুত ব্যবস্থা! একটি দেশ লটকে গেলো দুটি দেশের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গকে যে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হলো, সেই পাকিস্তানের সঙ্গে এর দূরত্ব হাজার মাইলেরও বেশি। পৃথিবীতে এর আগে এমন অদ্ভুত দেশ আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাঝখানে হাজার মাইলের ব্যবধান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো একটি অদ্ভুত দেশ—পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটি অংশের দুটি নাম দেয়া হলো। পূর্ববাংলার নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান।

দেশ দুটি।

মাঝখানে ব্যবধান হাজার মাইলের।

এই দুটি দেশের মানুষের ভাষা আলাদা।

সংস্কৃতি আলাদা।

আচার আচরণ ঐতিহ্য আলাদা।
জীবন-যাপন পদ্ধতি আলাদা।
অর্থনীতি আলাদা।
রাজনৈতিক বিশ্বাস আলাদা।
শুধু ধর্মটা এক। ইসলাম ধর্ম। কিন্তু এতোগুলো বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়েও শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে, শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে, একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে জোর করে আরেকটি ভিন্নমুখী রাষ্ট্রকে আবদ্ধ করে রাখা হলো।
একটি অবাস্তব রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হলো পাকিস্তান।
কিন্তু পূর্ব আর পশ্চিমতো কখনোই এক হতে পারে না। পূর্ব বাংলার বাঙালি আর পশ্চিম পাকিস্তানের ভিন্নভাষী মানুষদের নিয়ে এক জাতি গঠন করা যায় না কিছুতেই। পূর্ব আর পশ্চিমের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর তো কোনো মিল নেই! শুধুমাত্র ধর্মই যদি রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র ভিত্তি হতো, তবে তো সব মুসলিম দেশ মিলে একটি রাষ্ট্র হবার কথা। তবে তো খৃষ্টানদেরও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থাকার কথা নয়!
আলাদা ভাষা নিয়ে, আলাদা সংস্কৃতি নিয়ে, আলাদা ঐতিহ্য নিয়ে, আলাদা অর্থনীতি, আলাদা জীবন-যাপন পদ্ধতি, আলাদা সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে, হাজার মাইলেরও বেশি ভৌগলিক দূরত্ব নিয়ে দুটি দেশ একটি রাষ্ট্র হিশেবে পৃথিবীর মানচিত্রে দাঁড়িয়ে থাকলো অত্যন্ত নড়বড়ে অবস্থায়।

শোষণের ক্ষেত্র ঃ পূর্ব পাকিস্তান

অতঃপর শুরু হলো শোষণের আরেকটি নতুন অধ্যায়।
পূর্ব বাংলা, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণক্ষেত্রে পরিণত হলো অচিরেই। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চাইলো পূর্ব পাকিস্তানকে একটি কলোনী বানিয়ে রাখতে। নির্যাতিতদের কলোনী। পূর্ব বাংলার মানুষেরা কলুর বলদের মতো খাটবে। কিন্তু প্রাপ্য সম্মান ও সম্মানী তারা পাবে না। সৃষ্টি করা হলো বৈষম্য। পাহাড় সমান বৈষম্য।
পাকিস্তানের জাতির পিতা হিশেবে ঘোষণা করা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে। পাকিস্তান সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্বের দাবীদার হলেন জিন্নাহ। শত বছরের মানুষের সংগ্রাম রক্ত আর জীবন উৎসর্গের ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়া হলো শুরুতেই।
পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিলো ছয় কোটি। এর মধ্যে প্রায় চার কোটি ছিলো পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলার। অর্থাৎ, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তানের

রাজধানী হওয়া উচিৎ ছিলো ঢাকা। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা রাজধানী স্থাপন করলেন করাচীতে। এভাবে শুরুতেই সংখ্যাগুরুদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হলো সুপরিকল্পিতভাবে।
করচীতে রাজধানী স্থাপন করতে খরচ হলো কোটি কোটি টাকা। জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের রাজধানী হলো প্রথমে রাওয়ালপিণ্ডি। পরে ইসলামাবাদ। রাজধানী হিশেবে ঢাকাকে হিশেবের মধ্যেই আনা হলোনা। সংখ্যালঘুদের হাতে থাকলো শাসন ও শোষণের শৃঙ্খল। আর সংখ্যাগুরুরা হলো শোষিত।
পূর্ব ও পশ্চিমের হাজার মাইলেরও বেশি দূরত্বের মাঝখানে নির্মিত হলো পাহাড় সমান বৈষম্যের প্রাচীর। পশ্চিম পাকিস্তানীরা সাজলো প্রভু। আর পূর্ব পাকিস্তানীরা হলো গোলাম।
সবক্ষেত্রে বৈষম্য।
অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক—সবক্ষেত্রে।
শুরু হলো হামলা।
একের পর এক।
সাংস্কৃতিক হামলা।
অর্থনৈতিক হামলা।
রাজনৈতিক হামলা।
প্রথম হামলাটি এলো ভাষার ওপর।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঃ লড়াই হলো শুরু

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই। তখন, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দীন প্রস্তাব করেছিলেন—উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রস্তাব করেছিলেন—বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহর প্রস্তাব গুরুত্ব পায়নি।
পাকিস্তানের সংবিধান তৈরির জন্যে পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণ পরিষদ সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই অধিবেশনে ইংরেজি এবং উর্দু ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও গণ পরিষদের অন্যতম ভাষা হিশেবে স্বীকৃতির দাবি জানালেন। গণ পরিষদের বাঙালি সদস্যরা যাতে সংবিধান তৈরির বিষয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনায় অংশ নিতে পারেন সেজন্যেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছিলো। কিন্তু পাকিস্তানের

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

খাজা নাজিমুদ্দীন

লিয়াকত আলী খান

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বিরোধিতা করলেন সেই প্রস্তাবের। এই বিরোধিতার কারণে বাংলাভাষা স্থান পেলোনা পাকিস্তান গণ পরিষদে। ভাষা আন্দোলনের শুরু এভাবেই।

গণ পরিষদে বাংলাভাষার স্থান হয়নি বলে ঢাকার ছাত্ররা প্রতিবাদ সভা, সাধারণ ধর্মঘট, শোভাযাত্রা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। সেদিন ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছিলো, ছুঁড়েছিলো কাঁদানে গ্যাস। ফাঁকা গুলী বর্ষণও করেছিলো পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো একদল ভাড়াটে গুণ্ডা। অনেক ছাত্র আহত হয়েছিলো সেদিন। প্রায় এক হাজার ছাত্রকে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ। গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব সহ আরো অনেকে।

বাংলা ভাষার দাবি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিলো সেদিন, এভাবেই।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদের আজ্ঞাবহ পুলিশ বাহিনীর নির্যাতন নিপীড়ন আর দমননীতি থামাতে পারেনি আন্দোলন। দমে যায়নি ছাত্ররা। ঢাকার প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভবন (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেঙ্গে পড়া পুরাতন জগন্নাথ হল মিলনায়তন), বর্ধমান হাউসে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবন (এখন বাংলা একাডেমী), হাইকোর্ট ও সেক্রেটারীয়েটের সামনে প্রতিদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে ছাত্ররা। এই বিক্ষোভ এতটাই তীব্র ছিলো যে, তা দমনের জন্যে শেষমেশ তলব করতে হয়েছিলো সেনাবাহিনী।

আইন পরিষদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে ঘেরাও করে আটকে রেখেছিলো ছাত্ররা। নাজিমুদ্দীনকে উদ্ধার করতে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার আইয়ুব খান এসেছিলেন একদল পদাতিক সেনা

নিয়ে। নাজিমুদ্দীনকে বাবুর্চিখানার ভেতর দিয়ে বাইরে পাচার করা হয়েছিলো সেদিন।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন ১৬ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রে ৮টি দফা ছিলো। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ। বন্দি ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হয় ৫ মার্চ।

চুক্তিপত্রের ৮ দফায় বলা হয়েছিলো—

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা

১। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাঙলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্যে যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই তাহার স্থলে বাংলাভাষা সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাঙলার যে-সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

এই চুক্তির পাঁচদিনের মাথায় পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এলেন ঢাকায়। ২১ মার্চ ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানে (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমাবেশে জিন্নাহ বললেন, "... একথা আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদের বিভ্রান্ত করে তাহলে বুঝতে হবে, সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।"

জিন্নাহ বক্তৃতা করছিলেন ইংরেজিতে।

সমাবেশের একটি অংশে এসময় প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। 'না' সূচক প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয় সমাবেশের মধ্য থেকে।

২৪ মার্চ কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবেও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঘোষণা করলেন "রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিশেবে একটি ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু যা এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, যা পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং সর্বোপরি যার মধ্যে অন্য যে কোনো প্রাদেশিক ভাষা থেকে অধিক ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোতে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।"

প্রবল প্রতিবাদে 'না' 'না' ধ্বনিতে মুখর হয় ছাত্ররা, এখানেও। জিন্নাহর যুক্তিগুলো ছিলো ভুল এবং হাস্যকর। কারণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হওয়া উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। তখন, পাকিস্তানের শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ মানুষের ভাষা ছিলো বাংলা। বাকী পঁয়তাল্লিশ ভাগ মানুষের ভাষা ছিলো পাঞ্জাবি সিন্ধি পশতু ও বালুচি। আর উর্দুভাষীর সংখ্যা ছিলো শতকরা দুই ভাগেরও কম। অথচ জিন্নাহ্ সংখ্যাগরিষ্ঠের চাইতে সংখ্যালঘুদের প্রাধান্য দিতে দৃঢ় সংকল্প। বাঙালিদের দমিয়ে রাখার এ এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র।

১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চেই রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের প্রতিনিধি দলে ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাশেম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ সহ আরো অনেকে। দীর্ঘ আলোচনা হয় জিন্নাহর সঙ্গে। কিন্তু জিন্নাহ্ অগ্রাহ্য করেন প্রতিনিধি দলের দাবি।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়টি শেষ হয় এভাবেই।

নতুন ষড়যন্ত্র ঃ আরবি হরফে বাংলা

পশ্চিম পাকিস্তানীরা নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। বাংলা বর্ণমালাকে আরবি হরফে রূপান্তরের একটা প্রচেষ্টা চালানো হলো। প্রথম ষড়যন্ত্র ছিলো বাংলা হরফ পরিবর্তনের। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা হরফের পরিবর্তে আরবি হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা চালালো পশ্চিম পাকিস্তানীরা। এই প্রচেষ্টার শুরু ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি

মাসে। জেনারেল আইয়ুব খান প্রথমে রোমান এবং পরে আরবি হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলা সরকার বাংলাভাষা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষাকে বিকৃত করার জন্যে 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করেছিলো। মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। কবি গোলাম মোস্তফা, শেখ শরফুদ্দীন এবং আবু সাঈদ মাহমুদ এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন বিভিন্ন সময়ে।

ডঃ রফিকুল ইসলাম 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন—"১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্টে কমিটি বাংলা ভাষাকে কাটছাঁট করে 'মুসলমানী' করার বিভিন্ন কায়দা কানুন বাতলে দিয়েছিলো। পূর্ব বাংলা সরকার আট বৎসর পর্যন্ত এ রিপোর্টটি প্রকাশ করেনি। ১৯৫৮ সালের পরে আইয়ুব খানের আমলে এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।"

বাংলা বর্ণমালাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে ১৯৫১ সালেও। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা দফতর এক নির্দেশ জারি করে। নির্দেশে বলা হয়—"এখন থেকে মুসলমান বালকদের শিক্ষা আরবি বর্ণমালা দিয়ে শুরু হবে। নতুন ব্যবস্থায় শিশুরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরবি অক্ষর শিখবে, তৃতীয় শ্রেণীতে আমপারা আর চতুর্থ শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু।"

বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমান ইসলামী আদর্শের অজুহাতে বাংলা ভাষার জন্যে আরবি হরফ (প্রকারান্তরে উর্দু হরফ) গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পেশওয়ারে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় আরবি হরফকেই পাকিস্তানের একমাত্র হরফ করার জন্যে সুপারিশ করা হয়। বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের উদ্দেশ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে নিয়োগ করার জন্যে চেষ্টা চালানো হয়েছিলো। কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ্ রাজী হননি। ডঃ শহীদুল্লাহ্কে কব্জা করতে না পেরে চট্টগ্রামের মওলানা জুলফিকার আলীকে দিয়ে 'হরফুল কোরান সমিতি' নামে একটি কমিটি বানিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা চালানো হয়। পবিত্র কোরআন শরীফের হরফ প্রচারের নামে এই সমিতি বাংলা ভাষায় আরবি বা উর্দু হরফ প্রচলনের চেষ্টা চালিয়েছিলো। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। আরবি হরফ প্রবর্তন প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এবং ইকবাল হলে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো প্রতিবাদ সভা।

রাত ১২টায় ঢাকা হলের পুকুরের পূব ধারের সিড়তে জরুরী গোপন বৈঠক হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য সংগ্রামী কর্মসূচী স্থির করা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন—গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, মোহাম্মদ সুলতান, এম আর আখতার মুকুল, জিল্লুর রহমান, আব্দুল মোমিন, এস এ বারী এটি, সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন শহুদ, আনোয়ারুল হক খান, মঞ্জুর হোসেন এবং আনোয়ার হোসেন।"

গাজীউল হক লিখেছেন— '... বৈঠকে প্রথমেই স্থির করা হলো আমাকেই আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে, কিন্তু সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই যদি আমি গ্রেফতার হয়ে যাই তবে সভাপতিত্ব করবেন এম আর আখতার (মুকুল) এবং তাঁরও গ্রেফতারকৃত অপারগতায় সভাপতিত্ব করবেন কমরুদ্দিন শহুদ। বৈঠকে আরও একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ঃ 'সভা শুরু হওয়ামাত্র শামসুল হক সাহেবকে বক্তৃতা করতে দেয়া হবে এবং তারপর বক্তৃতা করতে দেয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিনকে। এরপর আমি সভাপতি হিসাবে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বক্তব্য রাখবো এবং ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সভার কাজ শেষ করবো।'

সে রাতের বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। তা হলো আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন তাদের মধ্যে একমাত্র হাবিবুর রহমান (শেলী) ছাড়া পারতপক্ষে আর কেউ গ্রেফতার বরণ করবেন না। আন্দোলনের স্বার্থেই তাদেরকে বাইরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।"

রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত বাংলাভাষা

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে ঢাকার সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জড়ো হতে থাকে সকাল সাড়ে আটটা থেকেই। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা সমাবেশকে প্রাণবন্ত করে তুললো। সশস্ত্র পুলিশ কলাভবনের সামনের রাস্তায় টহল দিতে শুরু করলো। পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো টিয়ারগ্যাস স্কোয়াড।

সকাল দশটার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহাসিক ছাত্রসভা। এই সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে প্রকম্পিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। দীপ্ত সাহসে বুক বেঁধে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে

উঠলো। উত্তাল জনস্রোতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবদুস সামাদ আজাদ কিভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে সেই ব্যাখ্যায় সোচ্চার হলেন। তার মতে, হাজার হাজার ছাত্রের বিশাল মিছিল যদি ১৪৪ ধারা অমান্য করে একই সঙ্গে রাস্তায় বেরোয় তবে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। তিনি 'দশজনী মিছিল'-এর প্রস্তাব করলেন। সিদ্ধান্ত হলো প্রতি দফায় দশজন করে ছাত্রের একটি দল রাস্তায় নামবে। ১৪৪ ধারা জারি হলে একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি লোক দলবদ্ধ হয়ে রাস্তায় বেরুতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী সমর্থন করলেন ছাত্রদের এই সিদ্ধান্ত। তার নির্দেশে খুলে দেয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের বিশাল লোহার ফটক।

শুরু হলো এক অভিনব বিদ্রোহ।

স্বেচ্ছায় গ্রেফতারবরণের বিদ্রোহ।

গ্রেফতার বরণের জন্যে সময়ের সাহসী সন্তানেরা দশজন দশজন করে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। প্রথম দলটির নেতৃত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুস সামাদ আজাদ এবং ইব্রাহীম তাহা। তৃতীয় দলে আনোয়ারুল হক খান এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান।

কলাভবনের ফটক দিয়ে দশজনী মিছিল নিয়ে ছাত্ররা বেরুচ্ছে, গ্রেফতার বরণ করছে ; এমন সময় পুলিশ হঠাৎ রাস্তায় এবং কলাভবনের গেটে শুরু করলো লাঠিচার্জ। পুলিশের অবিরাম লাঠিচার্জ এবং অসংখ্য টিয়ার গ্যাসের শেল

২১.২. ১৯৫২ : ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গাজীউল হক

কলাভবনের গেটে নিক্ষিপ্ত হলে মুহূর্তেই প্রতিবাদ-বিক্ষুব্ধ সামগ্রিক পরিস্থিতি হয়ে উঠলো অভূতপূর্ব। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারিদিক। চোখ জ্বালা করছে সবার। কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলে চলবে না। ছাত্ররা তাই হুড়মুড় করে দৌড়ে গেলেন কলাভবন এলাকার পুকুরে। চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে, পানিতে রুমাল ভিজিয়ে সেই রুমাল চোখে চেপে ধরে ফিরে এলেন ছাত্ররা ফের রণাঙ্গনে। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস আর লাঠিচার্জের জবাবে শুরু হলো ছাত্রদের পাল্টা আক্রমণ—ইটক নিক্ষেপ। ছাত্র-বনাম পুলিশের এই সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে টানা দুপুর পর্যন্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মধ্যবর্তী দেয়াল ভেঙে ফেললো ছাত্ররা পাল্টা আক্রমণ রচনার সুবিধার্থে। এর ফলে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের জায়গা বদলে গেলো। মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাক, হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলসহ কলাভবন, বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ এবং পরিষদ ভবন (জগন্নাথ হল মিলনায়তন) এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো সংঘর্ষ। আহত হলো অনেক ছাত্রছাত্রী। গ্রেফতার হলো অনেকে।

সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, ইটক ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গ্রেফতার চলতে থাকে অপরাহ্ণ অব্দি। ঐদিন বিকেল তিনটায় পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবার কথা। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করার জন্যে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ ছাত্রদের বাধা দেয়। কিন্তু সকাল থেকে পুলিশের হাতে মার

আবুল বরকত

রফিকউদ্দিন

শফিউর

খেয়ে খেয়ে ছাত্ররা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। পুলিশী বাধাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে থাকে-ছাত্ররা পরিষদ ভবনের দিকে। এ-সময় আচমকা, বলা নেই কওয়া নেই, কোনো রকম সতর্কবাণী ছাড়াই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে (বর্তমানে যেখানে শহীদ মিনার এবং ওষুধের দোকান) পুলিশ গুলীবর্ষণ শুরু করলো। মাণিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দীন আহমেদ এবং গফরগাঁও-এর আব্দুল জব্বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত এবং শিল্প বিভাগের পিওন আব্দুস সালাম গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। ওদের রক্তে রঞ্জিত হলো ঢাকার পীচঢালা রাজপথ। বাঙালির রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত হলো বাংলা বর্ণমালা। প্রিয় বাংলা ভাষা।

এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন— "গুলীর আওয়াজে সবাইকে শুয়ে পড়ুন বলে বিকট এক চীৎকার দিয়ে নিজেও মাটিতে সটান উপুড় হয়ে রইলাম। মাথার উপর দিয়ে কয়েক ঝাঁক গুলী গিয়ে মেডিক্যাল হাসপাতাল ভবনের দেয়ালে লাগলো। কাঁদানে গ্যাসের যন্ত্রণায় চোখ দু'টো কচলিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম। আহতরা ক্ষতস্থান ধরে চীৎকার করছে, আর সে সব ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। অনেকেই পানি পানি করে কাতর আর্তনাদ করছে। তখন সময় হচ্ছে বিকেল তিনটা দশ মিনিট।"

বর্বর এই হত্যাকাণ্ডের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। বিক্ষোভে ফেটে পড়লো সমগ্র পূর্ব বাংলা, বিশেষ করে ঢাকা নগরী।

পরদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ সর্বত্র উত্তোলন করা হলো কালো পতাকা। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শামিল হলেন গায়েবী জানাজায়। এই গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে। গায়েবী জানাজার পর বিক্ষুব্ধ আর শোকার্ত জনতা একটি 'শোক শোভাযাত্রা' বের করলো। বিশাল শোভাযাত্রা। এর আগে ঢাকায় এতো বড় শোভাযাত্রা বেরোয়নি। ঢাকা হাইকোর্ট এবং কার্জন হলের মাঝখানে রাস্তায় এসে শোভাযাত্রাটি পৌঁছুলে শোভাযাত্রার ওপর গুলীবর্ষণ করা হয়। এবার গুলীবর্ষণে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিলো ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীও। এদিন শহীদ হলেন হাইকোর্টের কর্মচারী সফিউর রহমান এবং রিকশাচালক আউয়াল। এছাড়াও ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর গুলীতে অন্তত: ৮ জন নিহত হয়েছেন বলে অনুমান করা হয়। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলীতে এবং বেয়নেট চার্জে অন্তত: ২ জন কিশোর নিহত হয়, যাদের লাশ সরিয়ে ফেলেছিলো পুলিশ। এদের একজনের নাম অহিউল্লাহ। অহিউল্লাহর বয়স বড়জোর ৮ কিংবা ৯। রাজমিস্ত্রি হাবিবুর রহমানের ছেলে অহিউল্লাহ ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডের খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে মাথায় রাইফেলের-গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় এবং গুম করা হয় তার লাশ।

২২ ফেব্রুয়ারি শোক শোভাযাত্রায় গুলীবর্ষণের পর উত্তেজিত জনতা প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের পত্রিকা দৈনিক সংবাদ এবং বাংলাভাষা-বিরোধী ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ অফিসে ও প্রেসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

দৈনিক আজাদের ২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়—"গত কালকের ঘটনার বিশেষত্ব হইল এই যে, সৈন্যগণকে অনেকক্ষেত্রে সঙ্গীনের খোঁচায় বিক্ষোভকারীগণকে ঘায়েল করিতেও দেখা যায়। বেলা প্রায় এগারোটার সময় রথখোলা ও নিশাত সিনেমা হলের মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চলতি সামরিক ট্রাক হইতে অপেক্ষমান নিরীহ পথচারীদের ওপরে বেপরোয়াভাবে গুলী চালানো হয়, যার ফলে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত ও দুইজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি বালককে বেয়নেট দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয়।"

২১ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের পাশে ছাত্রদের ব্যারাকের সামনে গুলীবিদ্ধ হয়েছিলো এক কিশোর। তাকে মেডিক্যাল কলেজে নেয়া হয়েছিলো। নিষ্ঠুর বুলেট তাকে বাঁচতে দেয়নি। সেই রাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো কিশোরটি। গাজীউল হক নাম না-জানা সেই কিশোরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন—"তার গায়ের রক্তাক্ত জামাটি বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে পরদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি মিছিল করেছিলো সবাই। সেই কিশোরের রক্তাক্ত জামাটি সেদিন পতাকা

চেতনার প্রতীক : শহীদ মিনার

হয়েছিলো ভাষা-সৈনিকদের। কিন্তু তার নাম তার পরিচয় আমাদের জানা হয়নি।"

ছাত্রদের ওপর গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লো বিক্ষোভ। সরকারী অফিস, রেলওয়ে, রেডিও সর্বত্র পালিত হলো ধর্মঘট। প্রায় অচল হয়ে পড়লো প্রশাসন। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুনরায় পালিত হলো হরতাল এবং সেদিনই, বরকত যেখানে গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন সেখানে, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা রাতারাতি নির্মাণ করলেন বাঙালির প্রথম স্মৃতির মিনার, শহীদ মিনার। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এই শহীদ মিনারটি হয়ে উঠলো বাঙালির সবচে' প্রিয় স্থান। সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র। এই শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে। কিন্তু সেদিন অপরাহ্নে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী ধ্বংস করে

দিলো বাঙালির হৃদয়ের মিনার, শহীদ মিনারটি। ইতোমধ্যে নিরাপত্তা আইনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক পুলীন দে, খয়রাত হোসেন, গোবিন্দলাল ব্যানার্জীকে গ্রেফতার করা হলো। ছাত্রাবাসগুলোতে হামলা চালিয়ে গ্রেফতার করা হলো শত শত ছাত্রকে। অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নূরুল আমিন সরকার বাংলাভাষা আন্দোলনকারীদের আখ্যা দিয়েছে ভারতের চর, বলেছে হিন্দু, কমিউনিস্ট ; বলেছে দুস্কৃতকারী, দেশদ্রোহী। কিন্তু চূড়ান্ত দমননীতি চালিয়েও ওরা স্তব্ধ করতে পারেনি বাঙালিদের। সেই যে জেগে উঠলো '৫২ সালে, সেই যে দাবির কথা বলতে শিখলো, আর তাকে বেঁধে রাখা যায়নি। শৃঙ্খল মুক্তির গান গাইতে শিখলো বাঙালি '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশের রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে বাঙালি এগিয়েছে সমুখপানে। আগুনঝরা সেই দিনেই সূচিত হয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার সোনালি অধ্যায়।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধানে বাংলা ভাষাকে উর্দুর সঙ্গে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকৃতি পেলো। সালাম বরকত রফিক জব্বারদের রক্ত বৃথা যায়নি। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার কথা ঘোষণা করা হলো। কিন্তু কার্যত, বাংলাভাষা, রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষা হতে পারেনি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে বাংলাভাষায় লেখা পৃথিবীর প্রথম সংবিধানটি চালু হয়েছিলো। বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা আছে— "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।" এভাবেই, বায়ান্নর একুশের রক্তঝরা সংগ্রামের কুড়ি বছর পর বাংলাভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা অর্জন করেছে।

অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন—"আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু হবে। বাংলাভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলাভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যতো খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা চালু করে দেবো, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে। পরে তা সংশোধন করা হবে।"

ভাষা শহীদদের স্মরণে ১৯৫৩ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে পালন করা হয় 'শহীদ

দিবস' হিশেবে। আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতাটি ১৯৫৩ সালে প্রথম গাওয়া হয়েছিলো গান হিশেবে। গানের সুরকার ও শিল্পী ছিলেন আবদুল লতিফ। ১৯৫৬ সালের পর আলতাফ মাহমুদ গানটিতে নতুন করে সুর সংযোজন করেছেন।

স্থিরচিত্র ঃ পূর্ব পশ্চিম

বাঙালি ফুঁসছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সীমাহীন নিপীড়নে ফুঁসছিলো বাঙালি ; পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতেই সৃষ্টি করা বৈষম্যের কারণে। বৈষম্যের চিত্রটা সত্যি ভয়াবহ। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই বলে জিকির তুলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ববাংলার মানুষদের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করলো। পাহাড় সমান ব্যবধান। বাঙালি স্পষ্টই বুঝতে পারলো—মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই হতে পারে কিন্তু বাঙালি আর অবাঙালি কিছুতেই ভাই ভাই হতে পারে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের সকল স্তরে নিযুক্ত অবাঙালির হার যেখানে শতকরা ৯৬ জন, সেখানে বাঙালি শতকরা মাত্র ৪ জন।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূতসহ বিভিন্ন পদে অবাঙালি কর্মচারির সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন। আর বাঙালি শতকরা মাত্র ৫ জন।

একজন বাঙালিও নেই কনার্স ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ডে।

একজন বাঙালিও নেই ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে।

একজন বাঙালিও নেই সেন্ট্রাল এডুকেশন বোর্ডে।

আর দেশরক্ষা বিভাগে শতকরা ৯১.৯ ভাগ অবাঙালি। বাঙালি শতকরা মাত্র ৮.১ ভাগ।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত দেশের সার্বিক উন্নতির জন্যে ধার্য করা হয়েছিলো ১১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১১০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানীরা রেখে পূর্ব বাংলাকে দিয়েছিলো মাত্র ২ কোটি টাকা।

অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের শতকরা ৭০ ভাগই আসে পূর্ব বাংলা থেকে।

শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যে মাথাপিছু ব্যয় করা হতো ৪ টাকা ৩ আনা ৩ পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু ১ পাইএর তিনভাগের ১ ভাগ। (১ টাকা= ১০০ পাই)।

শিল্প খাতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যে মাথাপিছু ব্যয় করা হতো ৭১ টাকা ৪ আনা ১৫ পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু ৫ টাকা ১২ আনা ৫ পাই।

সমাজ উন্নয়ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে মাথাপিছু ৫ টাকা ২ আনা ৭ পাই।

আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র ৯ আনা ৬ পাই।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বছর ৭০ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে, সে বছর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হয়েছে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।
ঢাকা রেডিওকে যে বছর বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, সে বছর পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিও খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।
কল-কারখানার মালিক সব অবাঙালি।
বাঙালির হাতে একটিও ব্যাংক নেই।
একটিও বীমা কোম্পানী নেই বাঙালির হাতে।
সবকিছুর মালিক অবাঙালিরা।
মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই নীতিতে এরকম পাহাড় সমান বৈষম্য নিয়ে, এতোটা শোষিত হয়ে কতোদিন থাকা যায় মুখ বুজে?

যুক্তফ্রন্ট ঃ হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী

১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বিরোধী দলগুলো নিয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এই কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিলো ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচী। ২১ দফার ভিত্তিতে এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হলো যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে ছিলো পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা।
এলো ১৯৫৪ সাল।
ভারত বিভক্তির পর এই প্রথম পাকিস্তানে দেয়া হলো সাধারণ নির্বাচন। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার পক্ষে রায় দিলো পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ। ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসনে জয়ী হলো যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লীগ জয়ী হলো মাত্র ৯টি আসনে।
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হলেন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী। বাঙালির বিজয়ের ইতিহাসে এ সময়টা সোনালি অধ্যায় হিশেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। গাজীউল হক 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন, "যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফল দেখে মনে হয়—এ যেন নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের এক জাতীয় উত্থান।"
কিন্তু ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে।
কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দিলো ৪৫ দিনের মধ্যেই।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শেখ মুজিবুর রহমান

এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার। নজরবন্দি করে রাখা হলো তাঁকে। আর গ্রেফতার করা হলো আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। মওলানা ভাসানী আর সোহরাওয়ার্দী তখন দেশের বাইরে।
নির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্বেও, এভাবেই ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলো বাঙালি।
১৯৫৫-১৯৫৬ সালে বাংলার রাজনীতিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক জামায়াতে ইসলামী দলের আবির্ভাব ঘটলো। মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এসময় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' তার নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি ছেঁটে দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলে আঘাত করলো প্রচণ্ডভাবে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সংযোজিত হলো নতুন এক অধ্যায়।

ওয়া আলাইকুম আসসালাম

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন—"যদি পূর্ব বাংলায় তোমরা তোমাদের শোষণ চালিয়ে যাও, যদি পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, তোমরা আমাদের কাছ থেকে একটি কথাই শুনে রাখো—ওয়া আলাইকুম আসসালাম, তুমি তোমার পথে যাও, আমরা আমাদের পথে যাবো।"

১৯৫৭ সালের ২৭ জুলাই পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বনিবনা না হওয়ার কারণে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে যান এবং বামপন্থী দল 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠন করেন।

সামরিক শাসন ঃ আইয়ুবের উত্থান

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খানের যোগসাজশে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (মনোনীত) ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো সামরিক শাসন জারি করলেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হলেন জেনারেল আইয়ুব খান। এর কিছুদিন পরেই, ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান সরিয়ে দিলেন ইস্কান্দার মির্জাকে। শুধু ক্ষমতা থেকেই সরালেন না—তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হলো। আইয়ুব খান হলেন একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং প্রেসিডেন্ট।

করাচীতে ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হলো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। পরদিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকা এলে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো ছাত্ররা। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-শিক্ষকদের হাতে নাজেহাল হলেন আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের।

বাঙালির প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ইন্তেকাল করলেন ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল। প্রিয় নেতার লাশ নিয়ে শোকার্ত ঢাকাবাসীর শোক শোভাযাত্রাটি হয়ে ওঠে পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির তীব্র ঘৃণা আর ক্ষোভের শোভাযাত্রা। ১৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সোহরাওয়ার্দী ঢাকা এলে বিশাল গণসম্বর্ধনার পর তাঁকে নিয়ে যে বিরাট শোভাযাত্রাটি বেরিয়েছিলো, তার মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে বাঙালির সামরিক শাসন বিরোধী সংগ্রামী মনোভাব।

এলো ১৯৬২ সাল।

১৯৫২ সালের দশ বছর পর ১৯৬২ সালে ছাত্ররা আবারো গর্জে উঠলো। এবার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো ছাত্ররা। আইয়ুব খান 'শরীফ কমিশন' নামে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। এই কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিলো তাতে শিক্ষাকে মানুষের জন্মগত অধিকার বলে মানা হয়নি। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা যাতে সরকারী খরচে লেখাপড়ার অধিকার না পায়—সে জন্যেই এই ষড়যন্ত্রমূলক কমিশন গঠন করা হয়েছিলো। কিন্তু রুখে দাঁড়ালো ছাত্ররা। শুরু হলো আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মিছিল। শ্লোগান।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মিছিলের ওপর গুলীবর্ষণ করলো আইয়ুব শাহী। ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হলো আবারো। মোস্তফা, বাবুল এবং ওয়াজিউল্লাহ নামের তিন যুবক বুকের রক্ত ঢেলে প্রতিবাদ জানালো সামরিক জান্তা আইয়ুবের বিরুদ্ধে। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট গৃহীত হলো না। গৃহীত হতে পারলো না। আইয়ুবের বিরুদ্ধে বাংলার বিদ্রোহী ছাত্রদের এটা ছিলো প্রথম বিজয়। প্রতিবছর এই তিন যুবকের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে স্মরণ করেই ১৭ সেপ্টেম্বর দিবসটি পালিত হয় 'শিক্ষা দিবস' হিশেবে।

১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দলের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। সোহরাওয়ার্দী মৃত্যু বরণ করেন লেবাননের বৈরুতের একটি হোটেলে। বৈরুত থেকে সোহরাওয়ার্দীর লাশ ঢাকা এলে শোকার্ত জনতার ঢল নেমেছিলো রাজপথে।

এলো ১৯৬৫ সাল।

পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে লেগে গেলো যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হয় ৬ সেপ্টেম্বর। স্থায়ী হয় ১৭ দিন। জাতিসংঘ এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই যুদ্ধের সময়ই পূর্ববাংলার অধিবাসীরা আরো একবার স্পষ্ট চোখে দেখতে পায়—পশ্চিমের তুলনায় পূর্ব কতোটা উপেক্ষিত এবং অরক্ষিত। কতোটা শোষিত এবং বঞ্চিত। সামরিক খাতে পাকিস্তানের যা বরাদ্দ ছিলো তার পুরোটাই ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো নৌবহর ছিলোনা। সৈন্য ছিলো মাত্র ১ ডিভিশন। আর ছিলো মাত্র ১ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে—পূর্ব বাংলা আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ মাত্র।

এদিকে, পাক-ভারত যুদ্ধ অবসানের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ এবং পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে আইয়ুব-বিরোধী মূল দলগুলোর পক্ষে নেজামে ইসলামী নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' আহ্বান করেন। সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "১৭ দিনব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্যে ১২ শত মাইল দূরবর্তী পূর্ব বাংলা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় এতিমের মতো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে নিপতিত ছিলো। এজন্য পূর্ব বাংলার ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে দল-মত নির্বিশেষে সবারই উচিৎ সর্বান্তকরণে ৬ দফা দাবি সমর্থন করা।" শেখ মুজিব উত্থাপিত আওয়ামী লীগের 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচী' শিরোনামে বলা হয়—

বাঁচার দাবি : ৬ দফা

১ নং দফা
শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

২ নং দফা
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩ নং দফা
মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে :
(ক) সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৪ নং দফা
রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির সবরকম করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

৫ নং দফা
বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।
(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে।
(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মেটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না।
(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬ নং দফা
আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

৬ দফার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন যাতে অবসান ঘটে পূর্ব পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক অবস্থার।

৬ দফা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচার ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আধা ডজন মামলা দায়ের করে। এবং তারপরই শুরু হয় শেখ মুজিবের ওপর হয়রানী। তাকে গ্রেফতার করা হয়, আবার জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। আবার গ্রেফতার করা হয়, আবারও জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। এভাবে গ্রেফতার এবং মুক্তি চলতে থাকে এপ্রিল পর্যন্ত। তারপর ১৯৬৬ সালের ৮ মে 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল'-এ গ্রেফতার করা হলো শেখ মুজিবকে। এসময় আওয়ামী লীগের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হলে আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ডাক দেয় হরতালের। হরতালের সময় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ১১ জন। শত শত আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৭ সালের শেষদিকে আইয়ুব সরকার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামী করে পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে দায়ের করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। কদিন পরেই দেখা গেলো, অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন অভিযোগে আটক শেখ মুজিবুর রহমানকে এই মামলায় জড়িত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শেখ মুজিবকে করা হলো এই মামলার পয়লা নম্বর আসামী। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি রাতে প্রায় ১১ মাস আটক রাখার পরে শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং

জেলখানার ফটক থেকেই আবার গ্রেফতার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা সেনানিবাসে। ওখানে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আটকে রাখা হয় তাকে। মামলার শুনানী শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন। এই মামলার অন্যান্য আসামীরা ছিলেন—কর্পোরেল আমির হোসেন, এল এস সুলতানউদ্দীন আহমদ, কামালউদ্দিন আহমদ, স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজুল্লাহ, জহুরুল হক প্রমুখ পাকিস্তান স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর কয়েকজন বাঙালি কর্মচারী এবং তিনজন সিএসপি অফিসার—আহমদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও শামসুর রহমান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব বাংলা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলো সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ ছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক। ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় তোফায়েল আহমদ ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি।

ছাত্রদের ১১ দফা

১। ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই এ, আই এস-সি, আই কম ও বি এ, বি এস-সি, বি কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম এ ও এম কম ক্লাশ চালু করিতে হইবে।

ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহন করার অপরাধে স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেণ্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

ঙ) হল, হোষ্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে।

জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

ঝ) মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স-ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষের ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স' কোর্সের সুযোগ দিতে হইবে। এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পদ্ধতির ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই. ই. আর ছাত্রদের দশ-দফা, সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম. বি. এ. ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা "ফ্যাকাল্টি" করিতে হইবে।

ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

ঢ) ট্রেনে, ষ্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় কমিশন শিক্ষা রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে :

ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা—এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী রপ্তানী চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রফতানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে। এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্নমূল্য মণ-প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে। (সংক্ষিপ্ত)

এই ১১ দফাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অভাবনীয় স্বাধিকার আন্দোলন। এই গণ আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যখন শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের বিচারের নামে প্রহসন করে চরম দণ্ড দেওয়ার নীল নকশা প্রণীত হচ্ছিলো, তখনই মওলানা ভাসানী আন্দোলন শুরু করলেন ; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামীকে মুক্ত করার আন্দোলন। ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর বিরাট জনসভা করলেন মওলানা ভাসানী। জনসভায় জনতা শপথ করলো ভাসানীর কাছে—জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো। এই শ্লোগানে কেঁপে উঠলো পূর্ব বাংলা। ভাসানী জনসভা শেষ করে জনতার বিশাল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ঘেরাও করে রাখলেন গভর্নর হাউস। ঐদিনই মওলানা ঘোষণা করলেন—৭ ডিসেম্বর ঢাকায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিলের দাবিতে পালিত

হবে হরতাল। হলোও তাই। পুলিশ ইপিআর মিলিটারী সমবেতভাবে চেষ্টা করেও হরতাল বানচাল করতে পারেনি। পারেনি জনতাকে ঠেকাতে। গুলীতে নিহত হলো অনেকে। ঢাকার রাজপথ রক্তরঞ্জিত হলো আবারও।

পরদিন বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মওলানা ভাসানী নিহতদের স্মরণে গায়েবী জানাজা পড়লেন সামরিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। পুলিশ ইপিআর মিলিটারী কেউ সেদিন সরাতে পারেনি মওলানাকে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে যে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিলো সেই গণ-আন্দোলনেই শ্লোগান উঠেছিলো "জাগো জাগো বাঙালি জাগো। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাঙলা স্বাধীন করো।" ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সাহসী তরুণ আমতলায় প্রতিবাদ সভা করেছিলো এবং সামরিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা বের করেছিলো বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন থেকে। শত শত পুলিশ আর ইপিআর ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সেদিন। সেই শোভাযাত্রার সাহসী তরুণদের প্রত্যেকেই সেদিন আহত হয়েছিলো এবং গ্রেফতার হয়েছিলো। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার সাহসী তরুণ ছাত্র আবারও একইভাবে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অকুতোভয় সৈনিকের মতো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সময়ের সাহসী সন্তান, আমাদের চেতনার অগ্নিপুরুষ, কৃষক-আন্দোলনের উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ ২০ জানুয়ারি অসুস্থ শরীর নিয়ে

৮.১২.১৯৬৮ : সান্ধ্যআইন অমান্য করে গায়েবানা জানাজা পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মওলানা ভাসানী

ছুটে এসেছিলেন প্রতিক্রিয়ার লৌহ কঠিন দুর্গ ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে। শরীরে জ্বর ছিলো তার প্রচণ্ড।
শরীর কাঁপছিলো জ্বরে।
শরীর কাঁপছিলো ক্রোধে।
আসাদের দীপ্তিময় চোখদুটি থেকে যেনো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিলো আগুন। সে আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলো আইয়ুব শাহীর গদি।
আসাদ তাই টার্গেটে পরিণত হলেন মুহূর্তেই আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর। মাত্র ১০ হাত দূর থেকে নির্ভুল নিশানায় গুলী করা হলো আসাদকে। বুলেট এসে বিদ্ধ করলো বাংলাদেশের সোনার টুকরো ছেলে আসাদুজ্জামানের বুক। ঢলে পড়লো আসাদের দেহ। আসাদের রক্তে ভিজে গেলো পূর্ব-বাংলার মাটি। পরম নিশ্চিন্তে যেনো জননী জন্মভূমির কোলে মুখটি গুঁজে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো আসাদ। সোনার টুকরো ছেলে আসাদ।
এভাবে যাঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, এভাবে যাঁরা মৃত্যুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পারে, এভাবে যাঁরা রাজপথে ঢেলে দিতে পারে বুকের তাজা রক্ত, তাঁদের পরাজিত করে এমন শক্তি পৃথিবীর কারো নেই।
সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে।
সমগ্র পূর্ব-বাংলা জেনে গেলো তার সাহসী সন্তান আসাদ নেই। আসাদের মৃত্যু-সংবাদে কেঁপে উঠলো পূর্ব-বাংলা।
হরতাল।
হরতাল।
হরতাল।
ঢাকা বন্ধ।
"১১ দফা মানতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট পুড়িয়ে দাও। শেখ মুজিবকে ছাড়িয়ে নাও। জেলের তালা ভাঙতে হবে, রাজবন্দিদের আনতে হবে। শোষণের দুর্গ ভাঙতে হবে, স্বাধীকার আনতে হবে। আইয়ুব সরকার নিপাত যাক। মুক্তির একই নাম—সংগ্রাম সংগ্রাম"—প্রচণ্ড গর্জন-ধ্বনিতে দিশেহারা হয়ে উঠলো আইয়ুব খান। টলটলায়মান হয়ে উঠলো তার স্বৈরাচারী সিংহাসন। আসাদের রক্ত থেকে বিদ্রোহের যে আগুন প্রজ্জ্বলিত হলো সেটা মুহূর্তেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো গোটা পূর্ব-বাংলায়। জনতার ক্রুদ্ধ গর্জনে 'লৌহমানব' আইয়ুব খান দিশেহারা হয়ে পড়লেন।
ক্রোধে উন্মত্ত জনতা শহীদ আসাদের লাশ ছিনিয়ে নেবার জন্যে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে অবতীর্ণ হলো মুখোমুখি লড়াই-এ। আসাদের রক্তমাখা শার্ট মুহূর্তেই পতাকা

আসাদুজ্জামান

মতিউর রহমান

হয়ে উঠলো সংগ্রামী ছাত্র-জনতার।
২৪ জানুয়ারি ছিলো পূর্ব-ঘোষিত প্রতিবাদ দিবস। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে দিবসটি রূপান্তরিত হলো গণ-অভ্যুত্থান দিবস-এ। সেক্রেটারীয়েট-এর ১ নম্বর গেটে বিক্ষুব্ধ জনতার উত্তাল মিছিলে গুলীবর্ষণ করলো দিশেহারা আইয়ুবের সশস্ত্র বাহিনী। গুলীতে নিহত হলেন শেখ রুস্তম আলী। নিহত হলেন মকবুল। নিহত হলেন নবকুমার ইন্সটিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর, মতিউর রহমান মল্লিক। শান্ত, শ্যামল স্নিগ্ধ অপরূপ কিশোর মতিউর। কিশোর মতিউরের রক্তে লাল হয়ে গেলো ঢাকার পীচঢালা কালো পথ। দুর্বার গণ-আন্দোলনে অমিত শক্তি যোগালো মতিউর, তাঁর জীবন উৎসর্গ করে।
আসাদ এবং মতিউরের মৃত্যুসংবাদ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলো এই খণ্ড-খণ্ডকে। মরিয়া হয়ে উঠলো এদেশের মুক্তি পাগলমানুষ—মানি না মানি না, মানবো না মানবো না।
সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে।
শহীদ কিশোর মতিউরের লাশ নিয়ে জনতা ঢাকায় বিশাল শোকসভায় সমবেত হলো। ঢাকার সর্ববৃহৎ শোক শোভাযাত্রা সেদিন রাজপথ প্রদক্ষিণ করছিলো মতিউরের লাশ নিয়ে। সেদিনই ক্রুদ্ধ জনতা আগুন দিলো দৈনিক পাকিস্তান এবং মর্নিং নিউজ অফিসে। সেদিনই জনতা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলো আইয়ুব খানের কয়েকজন চাটুকারের বাসভবন।
পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হলো কয়েক সহস্র রাজনৈতিক কর্মীকে। কিন্তু জীবনকে যারা তুচ্ছ করে বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে অসীম

ডঃ শামসুজ্জোহা

সার্জেন্ট জহুরুল হক
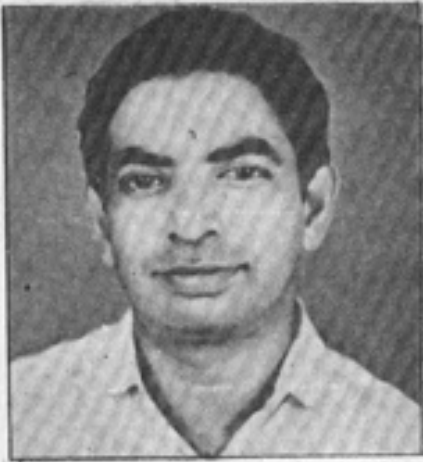
সাহস নিয়ে, শত দমননীতিতে বেঁধে তাদের কি আটকে রাখা যায়? সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শপথ দিবস হিশেবে ঘোষণা করলো ৯ ফেব্রুয়ারিকে। শপথ দিবসে জনতা শপথ নিলো—১১ দফা দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করবে জীবনের বিনিময়ে। রক্তের বিনিময়ে। কোটি কণ্ঠের সম্মিলিত হুংকারে কম্পমান পূর্ব-বাংলার সংগ্রামী মানুষের দাবীর মুখে এশিয়ার লৌহ-মানব আইয়ুব খান বাধ্য হলেন মাথা নত করতে। ১১ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়া হলো রাজবন্দিদের। বিনা শর্তে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা গুটিয়ে নেয়নি তাদের ভয়াল থাবা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঘটে গেলো নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। ১৮ ফেব্রুয়ারি নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হলো দানবীয় হিংস্রতায়। প্রথমে গুলী করা হলো তাঁকে তারপর আহত শামসুজ্জোহার বুক এবং পেট চিরে দেয়া হলো বেয়নেটের খোঁচায়।

বিদ্যুৎ চমকের মতো ডঃ জোহার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র পূর্ব-বাংলায়। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো মানুষ। ফেটে পড়লো ওরা সীমাহীন ক্রোধ আর ঘৃণায়। ঢাকায় জারি হলো কারফিউ। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছুটে এলো রাস্তায় বিক্ষুব্ধ মানুষেরা। সেই রাতে টেলিভিশন এবং রেডিও-তে ডঃ জোহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোকার্ত মুক্তিপাগল মানুষেরা ছুটে এসেছিলো রাজপথে। দলে দলে। হাজারে হাজারে।

রাতভর ওরা লড়াই করেছিলো আইয়ুবের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে। ডঃ জোহার মৃত্যু

'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানকে রূপান্তরিত করলো গণ-বিস্ফোরণে। বেজে উঠলো আইয়ুবের পতনের ঘন্টাধ্বনি। বন্ধ হয়ে গেলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। শেখ মুজিবসহ এই মামলার সকল বন্দি মুক্তি পেলেন ২২ ফেব্রুয়ারি।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনার বিশাল জনসমুদ্রে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে ভূষিত করলেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু।

গোল টেবিল বৈঠক

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের জন্যে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ এক সর্বদলীয় গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। বৈঠকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া পাকিস্তানের প্রায় সবক'টা রাজনৈতিক দলের নেতাই যোগদান করলেন। এই গোল টেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবারও ৬ এবং ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলো গোল টেবিল বৈঠক। '৬৯ সালের ২৫ মার্চ সীমাহীন ব্যর্থতার গ্লানি কাঁধে নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। পতন হলো লৌহমানব আইয়ুব খানের।

এক খান গেলো।

আরেক খান এলো।

বাঙালির স্বপ্ন ভেঙে খান খান হলো। পাকিস্তানে প্রবর্তিত হলো সামরিক শাসন। সমগ্র পাকিস্তানের অবস্থা তখন বেকায়দাজনক। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যে ধূর্ত শৃগাল ইয়াহিয়া খান চাললেন এক নির্বাচনী চাল। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ এবং আইনগত কাঠামো ঘোষণা করলেন। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হলো।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ অবহেলার করুণ চিত্র

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে, বিশেষ করে পটুয়াখালী ও নোয়াখালী অঞ্চলে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রলয়ংকরী সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাস প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। বিশাল জনপদ

পরিণত হয় বিরাণভূমিতে।
একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের নিষ্ঠুরতা, অন্যদিকে বিরূপ প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা পূর্ব-বাংলার মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুললো। তাদের লড়াই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই প্রকৃতির বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী সরকার এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কোনো আমলই দিতে চাইলো না। তারা গোপন করতে চাইলো প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলোর কল্যাণে এই মহাপ্রলয়ের মর্মান্তিক ট্রাজেডির কথা জানতে পারে এদেশের ভাগ্যাহত মানুষেরা। ১৮ নভেম্বর মওলানা ভাসানী দুর্গত অঞ্চলে যাবার চেষ্টা করলে পতেংগায় তাঁর জাহাজ আটক করা হয়। কিন্তু তবুও থামানো যায়নি মওলানাকে। মওলানা ভাসানী উপদ্রুত অঞ্চল থেকে ফিরে ২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে বিশাল এক জনসভায় তুলে ধরেন দুর্গত অঞ্চলের দুঃসহ, মর্মান্তিক, ভয়াবহ চিত্র। পাকিস্তান সরকারের পদত্যাগ দাবি করে মওলানা ভাসানী বলেন, "বাঙালির জীবনে আজ মহা দুঃখের দিন। আমাদের জীবনে নেমে এসেছে মহাদুর্যোগ। বিধ্বস্ত বিরাণ উন্মুক্ত আকাশের নিচে আমাদের অগণিত মা-বোন উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। বিরাণ জনপদে কোথাও কাপড় নেই ; এই শীতের দিনে ধনী-গরীব কারও মাথা গোঁজার ঘর নেই। ...... হযরত নূহের জামানার পর এতোবড় প্রলয় কাণ্ড মানুষের ইতিহাসে ঘটেনি। পূর্ব বাংলার উপকূলের ১০ থেকে ১২ লক্ষ নর-নারী ও শিশু প্রাণ হারিয়েছে কিন্তু মহাধ্বংসযজ্ঞের ১০ দিন পরও প্রায় ৪ লক্ষ লাশ পড়ে আছে। এদের দাফনের কোন ব্যবস্থা নেই। গলিত লাশ ও মরা পশুর দুর্গন্ধের মধ্যে যারা এখনও আর্তনাদ করছে আল্লাহর কুদরতেই তারা বেঁচে আছে। .... আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইবোনের মৃত্যু সংবাদ রেডিও পাকিস্তান ও সরকার আমাদের জানায় নি। ৮ হাজার মাইল দূর থেকে বিবিসির মারফত আমরা এই দুঃসহ সংবাদ জানতে পেরেছি। এছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিক ও আলোকচিত্রশিল্পীরা এগিয়ে আসলেও আমাদের ইসলামাবাদের সরকার দুর্গত বাঙালির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।"
উপদ্রুত উপকূলে ১০ দিন ধরে পরিদর্শন এবং রিলিফ বিতরণ শেষে ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ নভেম্বর এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনে পরিস্থিতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে বলেন, "বিপর্যয়ের ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে উদ্ধার ও রিলিফকার্য শুরু হতো তাহলে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েও অনাহার, শীত ও চিকিৎসার অভাবে যে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হতো। .... ঘূর্ণিঝড়ের ১০ দিন পরেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট এক কণা রিলিফও পৌঁছেনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে

নিষ্ঠুর অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে দায়ী করছি। .... যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের উল্লেখযোগ্য সৈন্য মোতায়েন রয়েছে, তখন পটুয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের লাশ কবর দিতে হচ্ছে বৃটিশ মেরিনদের। .... বাঙালি প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের লাখো লাখো ভাইকে বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য আমরা আরো ১০ লাখ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারবো। ....আমরা এখন নিশ্চিত যে, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বাঁচাতে হলে ৬ দফা আর ১১ দফার ভিত্তিতে আমাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতেই হবে।"

৭০-এর নির্বাচন ঃ আওয়ামী লীগের জয়

পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদের ৩০টি আসনে নির্বাচন হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগ মাত্র ২টি আসন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের সবকটা আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবির পক্ষে পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ রায় দিলেন। সুস্পষ্ট রায়। এই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক দলগুলো বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী কোটি কোটি টাকা খরচ করেছিলো। ইসলামের জিগির তুলেছিলো। কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি।
পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের এই বিশাল বিজয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ও শোষক চক্র দিশেহারা হয়ে পড়ে। নির্বাচনের ফলাফলকে বানচাল করার জন্যে ওরা শুরু করে চক্রান্ত। একজন সুদক্ষ অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ইয়াহিয়া খান। ইয়াহিয়া তখন এমন একটা ভাব করছিলেন যাতে মনে হচ্ছিলো তিনি এই নির্বাচনের রায় মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু গোপনে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল "পিপলস পার্টির"-র নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বুনলেন ইয়াহিয়া খান।

১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি।

ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। ১২ ও ১৩ জানুয়ারি দু'দফা বৈঠক করলেন ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সংগে। বৈঠকশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনা সন্তোষজনক

হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। শেখ মুজিব বলেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খুব শিগগিরই ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।"
ঢাকায় তিনদিন অবস্থান করলেন ইয়াহিয়া। করাচী ফিরে যাবার সময় ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের বললেন, "শেখ মুজিব তার সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে যা বলেছেন তা পুরোপুরি সঠিক।" সহাস্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের হবু প্রধানমন্ত্রী বলে সম্বোধন করলেন ধূর্ত ইয়াহিয়া।
পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর লারকানার বাসভবনে বৈঠক করলেন। গোপন বৈঠক। এই বৈঠকে তাদের সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল পীরজাদা।
জানুয়ারির শেষদিকে ঢাকায় এলেন ভুট্টো। দলবলসহ। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভুট্টো। বৈঠকে শেখ মুজিব বললেন, শাসনতন্ত্র হবে ৬ দফাভিত্তিক। ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নব-নির্বাচিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনের দাবি জানালে ভুট্টো বললেন, "আরো আলোচনার প্রয়োজন।"
সাংবাদিক সম্মেলনে জুলফিকার আলী ভুট্টো লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেন।
১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঢাকায় প্রাদেশিক ভবনে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ৩ মার্চ সকালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশ আহ্বান করলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বললেন, "আওয়ামী লীগের ৬ দফার ব্যাপারে আপোষ বা পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তার দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে না, কারণ ভারতের শত্রুতা এবং ৬ দফা না মানার ফলে ঢাকায় তাদের অবস্থা হবে ডবল-জিম্মির শামিল।"
১৯ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টো প্রায় ৫ ঘণ্টা দীর্ঘ এক বৈঠকে বসেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অপারেশনের নীল নকশা তৈরী করা হয় এই বৈঠকেই।
২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে ২১ ফেব্রুয়ারির সূচনালগ্নে বঙ্গবন্ধু বললেন, "এই বাংলার স্বাধিকার—বাংলার ন্যায্য দাবিকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র চলছে। .... আর শহীদ নয়, এবার গাজী হয়ে ঘরে ফিরবো।"
২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডিতে গভর্ণর ও সামরিক প্রশাসকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা করলেন। ইয়াহিয়া খান বাতিল করলেন

তার মন্ত্রিসভা। এই বৈঠকে অনুমোদন করা হয় বাঙালিদের শায়েস্তা করার সামরিক পরিকল্পনা।
২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, "পাকিস্তানে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণে উদ্যত হয়েছে তখনই এই কৃষ্ণশক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ...... বাংলাদেশের জাগ্রত জনতাকে, কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্র-জনগণকে বিজয় বানচালের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ...... আমরা আজ প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন বিসর্জন করারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের একটি কলোনীতে বাস করতে না হয়। যাতে তারা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিশেবে সম্মানের সাথে মুক্ত জীবন-যাপন করতে পারে, সে প্রচেষ্টাই আমরা চালাবো।"
২৬ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো করাচীর প্রেসিডেন্ট হাউসে। অব্যাহত থাকে চক্রান্ত।
২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের সংসদ অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান জানালেন বঙ্গবন্ধু। ওদিকে লাহোরে ভুট্টো এক জনসভায় হুমকি দিলেন, "তার দলের কোন সদস্য যদি পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করে তবে তার দলের কর্মীরা ঐ সদস্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।"
১ মার্চ ১৯৭১।
হঠাৎ এক বেতার ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব-বাংলা। বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে ঢাকা। সেদিন বিকেলে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. আব্দুর রব, নূরে আলম

১৯৭১ : ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিত করলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা।

সিদ্দিকী জনগণকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। কিন্তু জনগণ অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানাতে থাকে। হোটেল পূর্বাণীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একইদিন বিকেলে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদের বৈঠক বাতিলের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা শহরে হরতাল, ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ রমনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরবর্তী কর্মসূচী জানানোর জন্যে জনসভার ঘোষণা দেন।

২ মার্চ ১৯৭১।

ঢাকা শহরে পালিত হলো পূর্ণ হরতাল। বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর সকাল ১১টায় ফার্মগেট এলাকায় আক্রমণ চালালো সামরিক বাহিনী। হতাহত হলো কমপক্ষে ৯ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহাসিক ছাত্র-সমাবেশ। এই সমাবেশে বক্তৃতা করলেন ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ছাত্রলীগ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসু-র সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন। এই ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশেই সর্বপ্রথম সবুজ জমিনের পটভূমির ওপর লালবৃত্তের মাঝখানে সোনার বাংলার সোনালি মানচিত্র সম্বলিত 'স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা' উত্তোলন করলেন ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব। সভায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার। সভাশেষে বিরাট শোভাযাত্রা স্বাধীনতার শ্লোগান দিতে দিতে চলে যায় বায়তুল মোকাররমের দিকে। রাতে বেতার মারফত ঢাকা শহরে জারি করা হয় সান্ধ্য-আইন। সান্ধ্য-আইন জারি ঘোষণার সংগে সংগে বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও শ্রমিক এলাকা থেকে ছাত্র-জনতা এবং শ্রমিকেরা সান্ধ্য-আইন অমান্য করে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। 'সান্ধ্য-আইন মানি না', 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' শ্লোগান দিতে দিতে অসংখ্য মিছিল স্বতস্ফূর্তভাবে প্রদক্ষিণ করতে থাকে ঢাকার রাজপথ।

আবারও গুলী।

শহরের বিভিন্ন স্থানে, ডিআইটি মোড়ে, মর্নিং নিউজ গভর্ণর হাউজের সামনে সান্ধ্য-আইন ভংগকারী জনতার ওপর গুলী চালালো মিলিটারী। সমস্ত শহরে ব্যারিকেড রচনা করলো ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। রামপুরায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে গিয়ে শহীদ হলেন ছাত্রনেতা ফারুক ইকবাল।

পরদিন ৩ মার্চ, দেশব্যাপী হরতালের দিনে চট্টগ্রামে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০-এ। যশোরে মিলিটারীর গুলীতে হতাহত হয় অনেক। মিছিলে মিছিলে শ্লোগানে শ্লোগানে উন্মত্ত হলো পূর্ব-বাংলা। সেদিনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের বিভিন্ন দলের ১০ জন নেতাকে বেতার

মারফত ১০ মার্চ ঢাকায় একটি বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অত্যন্ত ঘৃণার সাথে প্রত্যাখান করলেন সেই আমন্ত্রণ।

৩ মার্চ অপরাহ্ণে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন বঙ্গবন্ধু।

ডাকসু সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজের সমন্বয়ে গঠিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' ৩ মার্চ পল্টনের ঐতিহাসিক সভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। ঘোষণাপত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিশেবে ঘোষণা করা হয়। 'স্বাধীন বাংলাদেশ'-এর ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে বলা হয়।—

ইশতেহার নং/এক—জয় বাংলা
(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে। গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিশেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে। ৫৫ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকায় ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিশেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ।' স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে : (১) স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি এবং বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। (২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে। (৩) স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা .... গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশের' সর্বাধিনায়ক।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে :

- স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক।
- স্বাধীন করো স্বাধীন করো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো।
- স্বাধীন বাংলার মহান নেতা—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
- গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়—মুক্তিবাহিনী গঠন করো।
- বীরবাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো।
- মুক্তি যদি পেতে চাও—বাঙালিরা এক হও।

বাংলা ও বাঙালির জয় হোক, জয় বাংলা
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে ডঃ রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উক্ত ঘোষণাপত্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপনের প্রথম আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ। এর আগে জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি জানানো হলেও স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ সর্বপ্রথম ৫৫৫০৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকায় ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিশেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এই রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ' ঘোষণা দেয় এবং এ রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে সংগ্রামী ছাত্রসমাজই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্নকে প্রথম আনুষ্ঠানিক রূপদান করেছিলো।"

৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের আন্দোলনকারীদের 'দুস্কৃতকারী' আখ্যা দেন এবং ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন। ভুট্টো ঘোষণা করেন, তার দলও এ অধিবেশনে যোগ দেবে। একই দিনে বেলুচিস্তানের কসাই নামে কুখ্যাত লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিশেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৬ মার্চ এক অধিবেশনে মিলিত হয় এবং সে অধিবেশন সারারাত ধরে চলে।

এলো সেই কাংক্ষিত ৭ মার্চ। ১৯৭১। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। মুহুর্মুহু স্লোগানে উদ্বেলিত লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজির হলো তাদের প্রিয় নেতার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার জন্যে। জয় বাংলা, আপোষ না সংগ্রাম—সংগ্রাম সংগ্রাম, আমার দেশ তোমার দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ, পরিষদ না রাজপথ—রাজপথ রাজপথ, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো স্লোগানে স্লোগানে দোলায়িত হতে থাকে উত্তাল জনসমুদ্র। অপরাহ্ণ ৩টা ২০ মিনিটে সভামঞ্চে এলেন ধবধবে শাদা পায়জামা পাঞ্জাবি আর কালো মুজিব কোট পরিহিত দীঘল দেহী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সম্ভবতঃ জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং স্মরণীয় ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন,—

৭ মার্চ ঃ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম,

খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সংগে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস—এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল-ল জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে, ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি আমি এপর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও, একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো। ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তাদের বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার

বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলী করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউণ্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আর. টি. সি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবী মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল-ল' Withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য অন্যান্য যে জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে ; লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলী চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলী চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নেবার পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের

এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ দেওয়া-নেওয়া চলবে।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুজে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

মওলানা ভাসানীর সমর্থন

শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায়, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঘোষণার পর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করলেন অকুণ্ঠচিত্তে। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে ১৯৭১-এর ৯ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় মওলানা ভাসানী সুস্পষ্টভাবে তাঁর সমর্থনের কথা জানিয়ে দেন। এই জনসভার পরদিন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় বলা হয়—"ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার (৯ মার্চ) পল্টনের এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার আপোষও সম্ভব নয়।
তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এই দাবির মর্যাদা রক্ষা ক'রে অবিলম্বে সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা দানের আহ্বান জানান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে এই দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে এক হয়ে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন।

বর্তমান সংগ্রামের উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছে যে প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে আপোষ করবে।
তিনি বলেন, এই সন্দেহ অমূলক। শেখ মুজিব বা মওলানা ভাসানী বা যে কোনো নেতা যদি এ ব্যাপারে আপোষ করতে যায় তবে জনতা তাকে আস্ত রাখবে না। আপোষের সময় চলে গেছে। এখন আপোষের আর কোনো পথ খোলা নেই। মওলানা ভাসনী শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি আস্থা রাখার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁকে আপনারা অবিশ্বাস করবেন না।
শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার সংগ্রামী বীর হওয়ার আহবান জানান। ... ...

ঢাকা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ-এর ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ তা প্রচার করতে দেয় নি। ফলে বেতারের সমস্ত বাঙালি কর্মচারী বেরিয়ে এসেছিলো বেতার কেন্দ্র ছেড়ে। আর তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো ঢাকা বেতার কেন্দ্র। ৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর ধারণকৃত বক্তৃতাটি সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রচারের অনুমতি দিলে আবার চালু হয় ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান। ২৫ মার্চ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা আওয়ামী লীগের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হয় বেতার ও টেলিভিশন। বেতার ও টেলিভিশনে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। টেলিভিশনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন বন্ধ করে দেয়া হয়। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা এবং পাকিস্তান টেলিভিশন ঢাকার নাম বদলে রাখা হয় ঢাকা বেতার ও ঢাকা টেলিভিশন। ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র কালো পতাকা আর ২৩ মার্চ থেকে স্বাধীন বাংলার পতাকা ছাড়া কোথাও চাঁদতারা খচিত পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলিত হতে দেখা যায় নি।
১৪ মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বললেন, "মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।"
১৫ মার্চ ১৯৭১।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রায় সবক'টা জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকায় এলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ১৬ মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট হাউজে (পুরনো গণভবন) কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। শুরু হলো আলোচনার নামে প্রহসন। শুরু হলো আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ। ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ইয়াহিয়া-মুজিবের তৃতীয় দফা বৈঠক। ২০ মার্চের ১৩০ মিনিটের দীর্ঘ চতুর্থ বৈঠকে শেখ মুজিবের সংগে অংশ নিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং ডঃ কামাল হোসেন। ২১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ৯০ মিনিট দীর্ঘ আরও একটি বৈঠকে অংশ নিলেন শেখ মুজিব এবং তাজউদ্দীন। ১৬ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিলো আলোচনার নামে সময়-ক্ষেপণের প্রক্রিয়া। সংকট নিরসনের অজুহাতে একদিকে চলছিলো লাগাতার আলোচনা আর অন্যদিকে চলছিলো সামরিক আক্রমণের গোপন প্রস্তুতি। জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, জেনারেল মিঠ্ঠাদের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে প্রস্তুত করছিলেন সামরিক আক্রমণের নীল নকশা। প্রতিদিন পি. আই. এ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স) এবং বোয়িং-৭০৭ যোগে ঢাকায় জড়ো করা হচ্ছিলো সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের যাবতীয় রসদ। ৬ থেকে ১৭টি ফ্লাইট প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেছে পশ্চিম থেকে

পূর্বে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ঢাকায় সৈন্য, অস্ত্র এবং যুদ্ধের রসদ যোগান দিয়ে ফিরতি ফ্লাইটে পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিলো সামরিক বাহিনীর পরিবারের সদস্যদের এবং অবাঙালি পুঁজিপতিদের। শুধু আকাশ-পথে নয় জলপথেও জাহাজযোগে সৈন্য, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ আসছিলো চট্টগ্রামে।
২১ মার্চ বারো জন উপদেষ্টাসহ কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকায় এলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

২২ মার্চ ১৯৭১।
আবারও ইয়াহিয়া বৈঠকে বসলেন মুজিবের সঙ্গে। সঙ্গে ভুট্টোও থাকলেন। বৈঠক চললো টানা ৭৫ মিনিট। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস'-এ বাংলাদেশের সর্বত্র—বাড়ির ছাদে, যানবাহনে, উড়লো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সঙ্গে একটি কালো পতাকা। সকালে পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হলো 'জয় বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজ। স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। রেকর্ডে বাজানো হলো জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' জয় বাংলা বাহিনীর ১০টি প্লাটুন এবং ১টি ব্যাণ্ড প্লাটুন ছিলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা জয় বাংলা বাহিনী পরিদর্শন করলেন সামরিক কায়দায়। কুচকাওয়াজ শেষে চার নেতার নেতৃত্বে জয় বাংলা বাহিনী মার্চ করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলে তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন বঙ্গবন্ধু।
২৩ মার্চ বায়তুল মোকাররমে ছাত্র-শ্রমিক নেতৃবৃন্দ একটি জনসভা করলেন। জনসভায় ঘোষণা করা হলো 'যে পতাকা আমরা প্রত্যাখান করেছি তা পুণরায় তোলা বা স্বাধীনতা থেকে পিছপা হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'
২৪ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন ও ডঃ কামাল হোসেন দুঘণ্টা স্থায়ী এক সভায় মিলিত হলেন ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সঙ্গে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর এবং ঢাকার মিরপুরে পাকিস্তান বাহিনীর প্ররোচনায় অবাঙালি বা বিহারীরা বাঙালি নিধন অভিযানে মেতে ওঠে। সেদিন যশোরে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেড কোয়ার্টার-এ রাইফেলসের বাঙালি জওয়ানরা 'জয় বাংলা বাংলার জয় গানটি গেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।
২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ একটি বিবৃতিতে বললেন, "আর আলোচনা নয় এবারে সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই।" ইয়াহিয়ার সঙ্গে

বৈঠকের পর ২৫ মার্চ ভুট্টো সাংবাদিকদের জানালেন "পরিস্থিতি অত্যন্ত আশংকাজনক।" ছুটে গেলেন সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে। দেশী-বিদেশী অসংখ্য সাংবাদিকের আনাগোনায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবন জনাকীর্ণ হয়ে উঠলো। এমন সময় খবর এলো ইয়াহিয়া খান শাদা পোশাকে গোপনে বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে যাওয়া ইয়াহিয়া খানকে অনুসরণ করলেন একইভাবে জুলফিকার আলী ভুট্টো। রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি পালিয়ে যাবার আগে ইয়াহিয়া খান তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাংলাদেশের নিরীহ নিরপরাধ আর নিরস্ত্র মানুষের ওপর দানবীয় হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। শুরু হলো ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণ-হত্যা।

পঁচিশের কালোরাত ঃ বাঙালি নিধন অভিযান

কোলাহল থেমে গেছে।
বাংলাদেশের বুকে নেমে এসেছে শান্ত-স্নিগ্ধ রাত। ঘুমিয়ে পড়েছে বাঙালি
আর তখনই, ঠিক তখনই ট্যাংক-মেশিনগান-মর্টারসহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী খানসেনারা মেতে উঠলো বাঙালি নিধন যজ্ঞে। পাকিস্তান বাহিনীর প্রথম আঘাত ছিলো বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ-শ্রমিক-পুলিশ-আনসার-ফায়ার বিগ্রেড-ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনা ও অফিসারদের ওপর। কিন্তু রুখে দাঁড়ালো বাঙালি। রুখে দাঁড়ালো বাংলার বীর পুলিশ বাহিনী, ইপিআর, বেংগল রেজিমেন্টের সাহসী যোদ্ধারা। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বেঁধে গেলো লড়াই। মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রেফতার করলো বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতার হবার আগে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে ওয়্যারলেস মারফত একটি বার্তা প্রেরণ করলেন বঙ্গবন্ধু। বার্তায় বঙ্গবন্ধু জানালেন, "পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ২৫ মার্চ রাত বারোটায় হঠাৎ ঢাকা পিলখানায় ইপিআর ঘাটি এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে বহু নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করেছে। ইপিআরের সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। মুক্তিকামী মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে, বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে যেকোনো মূল্যে শত্রুকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আপনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন। জয় বাংলা।"
২৫ মার্চ রাত বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার

জিয়াউর রহমান

হবার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ওয়্যারলেস যোগে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রেরণ করেন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রামে কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম এই ঘোষণা পাঠ করেছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন। মেজর জিয়ার এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলো দেশের মুক্তিপাগল মানুষ।

বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে রাখা হলো প্রথমে ঢাকায়, পরে পশ্চিম পাকিস্তানে।

ডঃ রফিকুল ইসলাম 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে লিখেছেন, "সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একাত্তরের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একজন বাঙালি মেজরের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা সেদিন বাঙালিকে তড়িৎ স্পর্শে জাগিয়ে তুলেছিলো। বিশ্ব জেনেছিলো বাঙালি মরেনি ; বাঙালি রুখে দাঁড়িয়েছে।"

শামসুল হুদা চৌধুরীর 'মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর' গ্রন্থে মেজর জিয়ার স্ব-কণ্ঠ টেপ থেকে উদ্ধৃত ভাষণটির প্রতিলিপি ও তার বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ 'মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে এভাবে—"আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক শেখ মুজিবুর

রহমানের পক্ষে আমরা এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগণের একমাত্র বৈধ সরকার, যা আইনসম্মত এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং যা পৃথিবীর সব সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

কাজেই আমি আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারের স্বীকৃতি দান এবং পাকিস্তানের দখলদার সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত ভয়াবহ গণহত্যাকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা একটি নির্মম তামাসা এবং সত্যের বরখেলাপ মাত্র, যার দ্বারা কারোই বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে প্রথম নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় শান্তি এবং তৃতীয় সবার সাথে বন্ধুত্ব এবং কারো সাথে শত্রুতা নয়। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা।"

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম কর্মী শামসুল হুদা চৌধুরী 'মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর' গ্রন্থে লিখেছেন, "২৬ মার্চ অপরাহ্ণ পৌনে দুটার সময় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ইতিপূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে জনাব এম, এ, হান্নানের (চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি) কণ্ঠে দেশবাসী প্রথম শুনলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা। তাঁর কণ্ঠে প্রচারিত হল পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসার অমোঘ আহ্বান।" চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারের যাত্রা শুরু হয়েছিল এভাবেই। শামসুল হুদা চৌধুরী লিখেছেন, "২৬ মার্চ '৭১ দ্বিতীয়বার সন্ধ্যে ৭টা ৪০ মিঃ সময়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ইথারে শুনলো বিপ্লবী বেতারের ঘোষণা। বেলাল মোহাম্মদের উদ্যোগে সংগঠিত ঐ ঐতিহাসিক সান্ধ্য অধিবেশনেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর ডাক্তার মনজুলা আনোয়ার অনূদিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী উপস্থাপন করলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। এরপর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার মূল ইংরেজি হ্যাণ্ডবিলটি পাঠ করলেন স্থানীয় ওয়াপদার প্রকৌশলী জনাব আশিকুল ইসলাম।...কবি আবদুস সালাম একই সন্ধ্যায় স্বাধীনতার সপক্ষে এবং হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে

আইয়ুব খান

ইয়াহিয়া খান

টিক্কা খান

আসার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রচার করেছিলেন। উল্লেখ্য যে বেলাল মোহাম্মদ সংগঠিত ঐ সান্ধ্য অধিবেশনেও জনাব আবদুল হান্নান আর একবার বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে তাঁর বক্তব্য প্রচার করেছিলেন।...বেলাল মোহাম্মদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত ঐ সান্ধ্য অধিবেশনটি প্রচারিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নাম ঘোষণা দিয়ে।'২৬ মার্চ ৭১ রাত দশটায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচিতি দিয়ে আরও একটি অতিরিক্ত অধিবেশন প্রচারিত হয়েছিল চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে। এই অতিরিক্ত অধিবেশন প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লণ্ডন থেকে সদ্য প্রত্যাগত তরুণ ব্যবসায়ী মাহমুদ হোসেন। সহযোগী উদ্যোক্তা ছিলেন ফারুক চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বেতারের নিজস্ব শিল্পী রঙ্গলাল দেব চৌধুরী। রাতের ঐ অধিবেশনে মাহমুদ হোসেন প্রায় দশ মিনিটব্যাপী একটি ইংরেজি ভাষণ প্রচার করেছিলেন। তাঁর ঐ ভাষণে ছিল বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন।.....উল্লেখ্য যে মাহমুদ হোসেন ও ফারুক চৌধুরী ২৭ মার্চ ৭১ দিবাগত রাতেই অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছিলেন।"

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ গ্রন্থে ডঃ রফিকুল ইসলাম লিখেছেন— "পাকিস্তান বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারটি ধ্বংস করে দেয় ৩১ মার্চ। তার আগেই অবশ্য ২৭, ২৮ ও ৩০ মার্চ পরপর তিন দিন মেজর জিয়া কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী এবং পাঞ্জাবিদের নৃশংসতার কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারে রামগড় থেকে এবং পরে মে মাস থেকে ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারে মুজিবনগর থেকে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কাল মুক্তিযুদ্ধের শব্দ সৈনিকের কাজ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করে যায়।"

পঁচিশের কালোরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর টার্গেট হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো, বিশেষ করে ইকবাল হল এবং লিয়াকত হল; ছাত্রীবাসগুলো, বিশেষ করে রোকেয়া হল। টার্গেট হলো রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ধানমণ্ডি শেখ মুজিবের বাসভবন। নরপশু ইয়াহিয়া এবং বেলুচিস্তানের কসাই জেনারেল টিক্কা ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি নিধনের যে নীল নকশা প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম দেয়া হয়েছিলো অপারেশন সার্চলাইট। অপারেশন সার্চলাইটের ছকটা ছিলো এরকম—

২৫ মার্চ বাঙালি হত্যার নীল নকশা
অপারেশন সার্চলাইট
(২৫ মার্চ দিবাগত রাতে কার্যকরী)

ভিত্তি ও পরিকল্পনা

১. আওয়ামী লীগের সমস্ত কার্যকলাপ বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচিত হবে। যারা আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ সমর্থন করে এবং সামরিক আইন মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থার বিরোধী, তাদের বিদ্রোহী হিসাবে গণ্য করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. যেহেতু সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে, সেইহেতু এ অপারেশনের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই অপারেশন আকস্মিক ও কটিকাময় এবং দ্রুততার সংগে তড়িৎ হামলার মাধ্যমে করতে হবে।

সাফল্যের জন্য প্রয়োজন

৩. এই অপারেশন একযোগে সমগ্র প্রদেশব্যাপী পরিচালনা করতে হবে।
৪. সর্বাধিক সংখ্যক রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতা এবং শিক্ষক সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চরমপন্থী মনোভাবাপন্নকে গ্রেফতার করতে হবে।
৫. ঢাকায় এই অপারেশনের শতকরা একশ ভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল এবং ব্যাপক তল্লাশি চালাতে হবে।
৬. ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণকারীদের ওপর সংগে সংগে বেপরোয়াভাবে গুলী করতে হবে।
৭. আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বেতার, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস এবং বৈদেশিক দূতাবাসের সমস্ত ট্রান্সমিটার বন্ধ করতে হবে।
৮. পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা সমস্ত প্রহরা ও সমরাস্ত্র ডিপোর দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং সামরিক বাহিনীর সকল পূর্ব পাকিস্তানী সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে হবে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এ একই নির্দেশ পালিত হবে।

হতবাক করা ও প্রতারণার পদ্ধতি

১. সর্বোচ্চ পর্যায়ে সলাপ (রাজনৈতিক কথাবার্তা) অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার প্রসূতি বিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করা হচ্ছে। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুজিবকে ধোঁকা দিতে হবে। তাঁকে আশ্বাস দিতে হবে যে, জনাব ভুট্টো একমত না হলেও আওয়ামী

লীগের দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ একটা ঘোষণা দিবেন।

কৌশলগত পর্যায়

১০. ক) যেহেতু গোপনীয়তা রক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য নিচে বর্ণিত দায়িত্বগুলো রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত সৈন্যদের দিয়ে করাতে হবে ঃ

(১) দরজা ভেঙে মুজিবের বাড়িতে প্রবেশ করে উপস্থিত সবাইকে গ্রেফতার করা। এই বাড়িটা সুরক্ষিত এবং প্রহরী বেষ্টিত রয়েছে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো ঘেরাও করা—ইকবাল হল [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়], লিয়াকত হল [কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়]।

(৩) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ করা।

(৪) যেসব বাড়িতে অস্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে, সেসব বাড়িগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা।

খ) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ না করা পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্য যাতায়াত এবং কর্মকাণ্ড শুরু হবে না।

গ) অপারেশনের রাতে ২২:০০ ঘন্টার (রাত ১০ টা) পর কাউকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বেরুতে দেয়া হবে না।

ঘ) যে কোন অজুহাত তৈরী করে প্রেসিডেন্ট ভবন, গভর্ণর হাউস, এম এন এ হোস্টেল, বেতার, টেলিভিশন এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এলাকায় সৈন্য মোতায়েন বাড়াতে হবে।

ঙ) মুজিবের বাড়িতে 'এ্যাকশন' করার সময় বেসরকারি গাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ্যাকশনের পদ্ধতি

১১. **ক. 'এইচ আওয়ার'—রাত একটা**

খ. এ্যাকশনের জন্য নির্ধারিত সময় ঃ

১. কমাণ্ডো (এক প্লাটুন) ঃ মুজিবের বাড়িতে—রাত ১টা

২ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ বন্ধ—রাত ১২ টা ৫৫ মিনিট

৩. সৈন্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘেরাও—রাত ১টা ৫ মিনিট

৪. রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং নিকটবর্তী অন্যান্য থানায় সৈন্য প্রেরণ—রাত ১টা ৫ মিনিট

৫. নিচের বাড়িগুলো ঘেরাও (ধানমণ্ডির ২৯ নম্বর রোডের মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি)—রাত ১টা ৫ মিনিট

৬. কারফিউ জারি—রাত ১১টায় সাইরেনের আওয়াজ এবং লাউড স্পীকারে ঘোষণার মাধ্যমে করতে হবে। প্রাথমিকভাবে ৩০ মিনিটের জন্য। এসময় কোন কারফিউ পাস ইস্যু করা হবে না। ডেলিভারী কেস এবং গুরুতর ধরনের হার্টের রুগীদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। প্রয়োজনীয় অনুরোধের ভিত্তিতে সামরিক তত্ত্বাবধানে এসব রুগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা যাবে। ঘোষণায় বলা হবে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে না।

৭. নির্দিষ্ট মিশনে সৈন্যদের পাঠানো হবে
(ছাত্রাবাস দখল ও তল্লাশি করতে হবে)—রাত ১১ টায়

৮. বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সৈন্য প্রেরণ—সকাল ৫ টায়

৯. রাস্তা ও নদীপথে তল্লাশি ঘাঁটি স্থাপন—রাত ২টায়

গ. দিনের বেলায় অপারেশনের কর্মসূচী ঃ

১.ধানমণ্ডিতে অবস্থিত সন্দেহজনক বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি করতে হবে। পুরানো শহরে হিন্দুদের বাড়িতেও তল্লাশি চালাতে হবে। (গোয়েন্দা বিভাগ বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করবে)।

২.সমস্ত ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সমস্ত 'সাইক্লোস্টাইল' মেশিন বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৩. কড়া ধরনের কারফিউ জারি করতে হবে।

৪. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে হবে।

১২. **সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব ঃ** স্ব স্ব ব্রিগেড কমাণ্ডাররা বিস্তারিত প্লানিং করবেন **কিন্তু নিচের বিষয়গুলো অবশ্য করণীয় :**

ক. সিগন্যালস্ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগসহ সমস্ত ইউনিটে চাকরিরত পূর্ব পাকিস্তানী সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে হবে। কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে।

বিশ্লেষণ ঃ আমরা পূর্ব পাকিস্তানী সৈন্যদের বিব্রত করতে চাই না ; আবার এদিকে তাদেরকে দায়িত্বেও রাখতে চাই না। এটা তাদের মনপুতঃ নাও হতে পারে।

খ. থানাগুলোতে পুলিশদের নিরস্ত্র করতে হবে।

গ. পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর ডিজিকে বাহিনী সম্পর্কে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. আনসারদের সমস্ত রাইফেল হস্তগত করতে হবে।

১৩. যে সব তথ্যের প্রয়োজন ঃ

ক. নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের কে কোথায় রয়েছেন ——

১. মুজিব, ২. নজরুল ইসলাম, ৩. তাজউদ্দীন, ৪. ওসমানী, ৫. সিরাজুল আলম, ৬. মান্নান, ৭. আতাউর রহমান, ৮. অধ্যাপক মোজাফ্ফর, ৯. অলি আহাদ, ১০. মতিয়া চৌধুরী, ১১. ব্যারিষ্টার মওদুদ, ১২. ফয়জুল হক, ১৩. তোফায়েল, ১৪. এন. এ. সিদ্দিকী, ১৫. রউফ, ১৬. মাখন এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা।

খ. সমস্ত থানাগুলোর অবস্থা এবং রাইফেলের সংখ্যা।

গ. শক্ত ঘাঁটি এবং অস্ত্রাগারের বাড়ির ঠিকানা।

ঘ. ট্রেনিং ক্যাম্পের এলাকা।

ঙ. সামরিক ট্রেনিং-এ উৎসাহদানকারী সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর ঠিকানা।

চ. বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্যকারী এমন সব সাধারণ বাহিনীর প্রাক্তন অফিসারদের নাম ও ঠিকানা।

১৪. **কমাণ্ড ও কন্ট্রোল ঃ** দু'টো কমাণ্ড স্থাপন করতে হবে।

ক. ঢাকা এলাকা ——

কমাণ্ড	ঃ মেজর জেনারেল রাও ফরমান
ষ্টাফ	ঃ ইষ্টার্ণ কমাণ্ড ষ্টাফ/অথবা এম এল এইচ কিউ
সৈন্য	ঃ ঢাকায় অবস্থানকারী

খ. প্রদেশের অন্যত্র —

কমাণ্ড : মেজর জেনারেল কে এইচ রাজা
টাক : ১৪ ডিভিশন এইচ কিউ
সৈন্য : ঢাকা ছাড়া অন্যত্র অবস্থানকারী সমস্ত সৈন্য

১৫. ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তা :
প্রথম পর্যায়ে : পিএএফসহ সবার অস্ত্র জমা নেয়া।

১৬. তথ্য সরবরাহ :
ক. নিরাপত্তা বিষয় খ. নীলনক্সা

সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব নির্ধারণ

ঢাকা এলাকা

কমাণ্ড ও কন্ট্রোল : মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী
হেড কোয়ার্টার : এম এল এ জোন 'বি'

সৈন্যবাহিনী
ঢাকায় অবস্থানরত ৫৭ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সৈন্য। অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব (সি ও হিসাবে লেঃ কর্ণেল তাজ দায়িত্ব নিবে), ২২ বালুচ, ১০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ লাইট এএ রেজিমেন্ট এবং কুমিল্লা থেকে ৩ কমাণ্ডো কোম্পানী।

দায়িত্ব
১. ২ ইষ্টবেঙ্গল, ১০ ইষ্টবেঙ্গল, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর হেডকোয়ার্টার (২৫০০) এবং রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।
২. বেতার, টেলিভিশন, ষ্টেট ব্যাংক এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করা।
৩. আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা। (তালিকা সরবরাহ করা হবে)।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।
৫. গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে অবস্থিত ফ্যাক্টরী ও সমরাস্ত্রের ডিপোর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

বাকী সৈন্য এবং ১৪ ডিভিশন হেড কোয়ার্টার
মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজার অধীনে থাকবে।

যশোর

সৈন্যবাহিনী
১০৭ ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার, ২৫ বালুচ, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট এবং ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

দায়িত্ব
১. ১ ইষ্ট বেঙ্গল, ইপিআর-এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশ নিরস্ত্র করা এবং আনসারদের কাছ থেকে অস্ত্র নেয়া।

২. যশোর শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।
৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও টেলিগ্রাফ দখল করা।
৪. নিরাপত্তা এলাকা নির্দিষ্ট ও প্রহরার ব্যবস্থা করা — যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর শহর, খুলনা-যশোর রোড এবং বিমান বন্দর।
৫. কুষ্টিয়ার টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে অকেজো করা।
৬. প্রয়োজনমত খুলনায় আরও ফোর্স পাঠানো।

খুলনা

সৈন্যবাহিনী
২২ এফ এফ

দায়িত্ব
১. শহরের নিরাপত্তা।
২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও বেতার ভবন দখল।
৩. ইপিআর-এর উইং হেডকোয়ার্টার, রিজার্ভ কোম্পানী এবং রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।
৪. আওয়ামী লীগ, কম্যুনিষ্ট ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

রংপুর-সৈয়দপুর

সৈন্যবাহিনী
২৩ ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার, ২৮ ক্যাভালরী, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

দায়িত্ব
১. রংপুর-সৈয়দপুরে নিরাপত্তা।
২. সৈয়দপুরে ৩ ইষ্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করা।
৩. সম্ভব হলে দিনাজপুরে ইপিআর-এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার এবং রিজার্ভ কোম্পানীগুলোকে নিরস্ত্র করা এবং সীমান্ত ফাঁড়িসহ এসব জায়গায় নতুন বাহিনী প্রেরণ করা।
৪. রংপুরে বেতার ভবন এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।
৫. রংপুরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।
৬. বগুড়ায় সমরাস্ত্রের ডিপোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

রাজশাহী

সৈন্যবাহিনী
২৫ পাঞ্জাব

দায়িত্ব
১. কমান্ডিং অফিসার হিসাবে সফকাত বালুচকে পাঠানো।
২. রাজশাহী বেতার ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।
৩. ইপিআর-এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার ও রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা।
৪. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।
৫. আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

সিলেট

সৈন্যবাহিনী

একটা কোম্পানী ছাড়া ৩১ পাঞ্জাব

দায়িত্ব

১. বেতার ভবন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।
২. বিমানবন্দর দখল করা।
৩. আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।
৪. ইপিআর-এর সেকশন হেড কোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা।

কুমিল্লা

সৈন্যবাহিনী

৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, $১\frac{১}{২}$ মর্টার ব্যাটারীজ, ষ্টেশন ট্রুপস ও কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (একটা কোম্পানী ছাড়া)।

দায়িত্ব

১. ৪ ইষ্ট বেঙ্গল, ইপিআর-এর কোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা।
২. কুমিল্লা শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।
৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।

চট্টগ্রাম

সৈন্যবাহিনী

২০ বালুচ ৩১ পাঞ্জাবের একটা কোম্পানী, ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ভারী কামান ও ফিল্ড কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার্স। এছাড়া 'এইচ আওয়ার' অর্থাৎ অপারেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল তার কম্যুনিকেশন ও ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার এবং মোবাইল বাহিনী নিয়ে কুমিল্লা থেকে সড়ক পথে চট্টগ্রাম উপস্থিত হবে।

দায়িত্ব

১. ইষ্ট বেঙ্গল, ইপিআর-এর সেকশন হেড কোয়ার্টার, ইবিআরসি এবং রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা।
২. পুলিশের কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার (২০ হাজার অস্ত্র) দখল করা।
৩. বেতার ভবন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।
৪. পাকিস্তান নৌবাহিনীর সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা (কমোডোর মোমতাজ)।
৫. ৮ ইষ্ট বেঙ্গলের সি. ও. জানজুয়া এবং সাইগ্রীর সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি চট্টগ্রাম না পৌঁছানো পর্যন্ত আপনার নির্দেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।
৬. যদি সি. ও. জানজুয়া এবং সাইগ্রী নিজেদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে আস্থাবান থাকে তা হলে নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে শহরের দিকে যোগাযোগকারী রাস্তায় একটা কোম্পানীকে 'ডিফেনসিভ পজিশনে' রেখে রোড ব্লক করবে। এতে করে ইবিআরসি এবং ৮ ইষ্ট বেঙ্গল তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করলেও আটকে পড়বে।
৭ আমি সংগে করে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নিয়ে যাচ্ছি। অপারেশনের রাতেই ইবিআরসি-এর সি. আই চৌধুরীকে গ্রেফতার করবে।

৮. উপরে উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করবে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তার উইটনেস টু সারেণ্ডার গ্রন্থে ২৫ মার্চের ভয়াল রাতের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত কাব্যিকভাবে—"আকাশে তারার মেলা। শহর গভীর ঘুমে নিমগ্ন। বসন্তের ঢাকার রাত যেমন চমৎকার হয়, তেমনই ছিলো রাত্রি। একমাত্র হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন ছাড়া অন্য সবকিছুরই জন্য পরিবেশটি চমৎকারভাবে সাজানো।.....সেসময় ঢাকা নগরী গৃহযুদ্ধের তাণ্ডব যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। চারঘন্টা যাবত বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখলাম। সেই রক্তাক্ত রাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—অগ্নিশিখা আকাশকে বিদ্ধ করছে। একসময় অগ্নিবর্ণের শোকার্ত ধূম্রকুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু পরমুহূর্তেই সেটাকে ছাপিয়ে উঠলো লকলকে অগ্নিশিখা। অগ্নিশিখা তারকাপুঞ্জকে স্পর্শ করতে চাইছে। মনুষ্য সৃষ্ট এই অগ্নিকুণ্ডের পাশে চাঁদের উজ্জ্বল আলো আর তারকাপুঞ্জের রক্তিম আভা ম্লান হয়ে উঠলো। বিশালদেহী ধূম্রকুণ্ডলী ও অগ্নিশিখা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুললো। অবশ্য শহরের অন্যান্য অংশে, যেমন দৈনিক পিপল-এর চত্বরও এই ভয়াবহ আতশবাজি খেলার শিকারে কোন অংশে কম নিপতিত হয় নি।....২৬ মার্চের সূর্য উদিত হবার আগেই সৈনিকরা তাদের মিশন সমাপ্তির রিপোর্ট প্রদান করলো। জেনারেল টিক্কা ভোর ৫টায় সোফা ছেড়ে উঠলেন এবং নিজের অফিসে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। ভালো করে চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, 'একটা মানষও নেই'!"

২৬.৩.১৯৭১ : বিশ্ববিদ্যালয় ইকবাল হলে (এখন জহুরুল হক হল) নিহত ছাত্রদের লাশের সারি

মুজিবনগরে স্বাধীনতা সনদ ঘোষণা এবং বাংলাদেশ সরকার গঠন

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার 'মুজিবনগরে' ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্র ঘোষিত হয় এবং গঠিত হয় প্রথম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"।

সেদিন কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে প্রায় ১০ সহস্র বাঙালির বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে আগরতলায় ১০ এপ্রিল যে "প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার" গঠিত হয়েছিলো তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হলো 'মুজিবনগর বাংলাদেশ সরকার' নামে। বৈদ্যনাথ তলার নাম পাল্টে রাখা হলো নতুন নাম— 'মুজিবনগর'। মুজিবনগরকে অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হলো বাংলাদেশের।

এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন বিদেশী সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয় এবং বলা হয় শেখ মুজিবুর রহমান যদি অনুপস্থিত থাকেন বা কাজ করতে না পারেন তাহলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রেসিডেন্টের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। মুজিবনগরের এই অনুষ্ঠানে অস্থায়ীভাবে তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী, মনসুর আলীকে অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী, এ. এইচ. কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ ও সাহায্য মন্ত্রী এবং কর্নেল ওসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। মুজিবনগরের ঐ অনুষ্ঠানে

১৭.৪.১৯৭১ : মুজিবনগরে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যবৃন্দ

তাজউদ্দিন আহমদ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

এম এ জি ওসমানী

সশস্ত্র আনসার ও ইপিআরের দুই দল জওয়ান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় সঙ্গীতটি পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী। আওয়ামী লীগ দলের চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার সনদটি পাঠ করেন।

মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার-গঠন হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই এলাকাটি দখল করে নিয়েছিলো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিশেবে মুজিবনগরের নামটি অপরিবর্তিত রেখেই পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে কলকাতা থিয়েটার রোড থেকে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনকেই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ জনগণের

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন
এবং
পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে
এবং
যেহেতু উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান
এবং
যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে
এবং
যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন
যেহেতু
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।
এবং
এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন।
রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,
তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,
রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবীর ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।
বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।
আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম।
এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

আনুগত্য প্রদর্শন

শাহাবুদ্দিন আহমদ এবং আমজাদুল হক নয়াদিল্লীর পাকিস্তান দূতাবাসের দুজন কর্মকর্তা। ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল পাকিস্তানের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন এই দুই কূটনীতিবিদ। বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রথম কূটনীতিবিদ এঁরাই। ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তান দূতাবাসের-সহ হাইকমিশনার হোসেন আলী ১০ জন কর্মীসহ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। সেদিন দুপুর ১২টায় কলকাতার পাকিস্তান মিশন ভবন থেকে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে সেখানে উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশের পতাকা। গাওয়া হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত—আমার সোনার বাংলা। এভাবেই বিদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস।

গণহত্যা '৭১

২৫ মার্চের পর থেকে সারাদেশ জুড়ে চলতে থাকলো পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর নৃশংস হত্যালীলা। বন্দীশিবিরে পরিণত হলো বাংলাদেশ। থমকে দাঁড়ালো মানবতা। উধাও হলো মানবতা। বিস্ময়ে হতবাক হলো বিশ্ববাসী। হত্যার নৃশংসতায় ইয়াহিয়া খান ছাড়িয়ে গেলেন হিটলারের বর্বরতাকে। মানুষরূপী পশু ইয়াহিয়া এবং টিক্কা খানের লেলিয়ে দেয়া হিংস্র আর বন্য সৈনিক-নামধারী খুনীরা অসউইজ আর বুখেন ওয়াল্ড-এর হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিলো।

২৪.১৯৭১ : যশোর শহরের উপকণ্ঠে হানাদার বাহিনীর শিকার অসহায় বাঙালিদের কয়েকজন

১৯৭১ : ভারতের কলকাতার উপকণ্ঠে আশ্রয় শিবিরে অসহায় বাঙালিরা

বাংলাদেশের চারিদিকে শুধু লাশ লাশ আর লাশ।

রাজপথে লাশ। নদীর বুকে লাশ। সিঁড়ির ওপরে লাশ। ফসলের ক্ষেতে লাশ। মসজিদে লাশ। মন্দিরে লাশ। গীর্জায় লাশ। প্যাগোডায় লাশ। গোটা বাংলাদেশটাই হয়ে উঠলো লাশের দেশ।

৭১-এর ২৫ মার্চ রাত থেকে বাংলাদেশ জুড়ে হানাদারবাহিনীর নির্বিচারে গণ-হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, লুন্ঠন এবং নারী নির্যাতনের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ নারী-শিশু-বৃদ্ধ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাংলাদেশের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম এবং বার্মায় পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১ কোটিতে।

প্রিয় নেতাকে ভোট দেয়ার শাস্তি যে কতোটা ভয়াবহ হতে পারে, সেটা দেশ ছেড়ে

পালিয়ে বিদেশের মাটিতে শরণার্থী হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা অসহায় মানুষদের মানবেতর জীবন যাপনের চিত্র স্বচক্ষে না দেখে অনুমান করার জো নেই।

বাঙালি নারী নির্যাতন ঃ নির্মম পাশবিকতার ভয়াল চিত্র

ধর্মের জিগির তুলে ইসলামকে বাঁচানোর অজুহাতে হত্যাযজ্ঞে মেতে থাকা পাকিস্তানী হানাদার পশুরা নির্বিচারে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়েসী বাঙালিদের শুধুমাত্র হত্যা করেই তৃপ্ত হয়নি। বাঙালি নারীর সম্ভ্রমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠেছে ইসলামের সদাজাগ্রত তথাকথিত সৈনিকেরা। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে পাকিস্তানের কথিত মুসলমান ভায়েরা এদেশের কতোলক্ষ নারীকে যে ধর্ষণ করেছে তার হিসেব নেই। ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ২ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়। এ প্রসংগে কয়েকটি বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট :

"সানডে টেলিগ্রাফের উদ্ধৃতি দিয়ে ২০ এপ্রিলের স্টেটসম্যান জানাচ্ছে : 'সমস্ত সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যায় পাঞ্জাবী ও বালুচী সৈন্যরা নির্বিচারে গুলী চালাচ্ছে ও ধর্ষণ করছে।' ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় সৈন্য নামার পর মেয়েদের রোকেয়া হল আক্রান্ত হয়েছিল। তার একটি ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন এ. স্যান্ডার্স; একজন বৃটিশ ব্যবসায়ী। তিনি ২ এপ্রিল ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁর একজন সহকর্মীর মেয়ে রোকেয়া হলে সৈন্যদের আক্রমণের শিকার হয়। তাঁর কাছ থেকেই তিনি এই বিবরণ জানতে পেরেছেন।—"৩৫০ থেকে ৪০০ পাকিস্তানী সৈন্য হল আক্রমণ করে। সমস্ত ঘরে ঢুকে তারা মেয়েদের টেনে বের করে নিয়ে আসে, তাদের কাপড়-চোপড় একে একে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয় ও তাদেরকে মারধোর করে।

চারদিক থেকে আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। শাড়ি, স্কার্ট, সালওয়ার সব খুলে ফেলে দেয়া হয়, তারপর কামিজ, ব্লাউজ, কাঁচুলি। মেয়েদেরকে পয়োধর বা চুল ধরে মাটি থেকে উঁচু করা হয়, কাউকে কাউকে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে উঁচু করা হয়।

তারা যখন হাত দিয়ে তাদের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছিল তখন সৈন্যরা তাদের গোপনাঙ্গে ভারী বুট দিয়ে লাথি মারে, হাত দিয়ে ঘুঁষি চালায়, অনেকে সেখানে বেয়োনেটের আঘাত করে, তখন সেখান থেকে ঝরতে থাকে রক্ত।

এর পরই মেয়েদেরকে জোর করে ধর্ষণ করা হয়।

মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে, তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু পশুরা নির্যাতন করতেই থাকে। একই মহিলাকে ১০/১২ জন জন্তু

পর পর ধর্ষণ করতে থাকলে রক্তের স্রোত বইতে থাকে। সৈন্যরা তাদের শয়তানের ক্ষুধা মিটিয়ে চলে গেলে বহু মেয়েই অজ্ঞান হয়ে যায়।
মেয়েদের অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে পড়ে যে, দেহ ঢাকার মত শক্তিও তাদের ছিল না।
তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল সৈন্যরা।
ঠিক এই সময়েই বর্বরদের হাতে পড়ার ভয়ে হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে ৫০ জন সাহসী ছাত্রী।
সবচেয়ে করুণ হচ্ছে হলের ছাত্রীদের দেখতে আসা একটি ১২ বছরের মেয়ের পরিণতি। এই কিশোরী এক জানোয়ার পাঠানের পাশবিক অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করে। মেয়েটি একবার করুণ চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে যায়, কিন্তু জন্তুটি তবুও অত্যাচার চালাতে থাকে।...অবশেষে জন্তুটি কিশোরীর গোপনাঙ্গের ওপর বুটের এক লাথি মারে। তার আগেই মেয়েটি মারা গেছে। রক্তের প্রবাহ ছুটতে থাকে—যেন কোন ট্যাপ খুলে দেয়া হয়েছে।
বোম্বের ব্লিৎস পত্রিকাকে এই বিবরণ নিজের স্বাক্ষর-সহ প্রকাশের জন্য প্রদান করেন এ. স্যাণ্ডার্স ব্লিৎস-এর ৬ এপ্রিল ১৯৭১ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল এই মর্মান্তিক বিবরণ।
সানডে টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে রাজাকাররা চট্টগ্রামের এক বিল্ডিংয়ে বহু যুবতীকে ধরে বেশ্যালয় চালাচ্ছে। বিভিন্ন অফিসারদেরকে মেয়ে সরবরাহ করাই তাদের প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে নিজেরাও দল বেঁধে পাশবিক অত্যাচার করে থাকে। ২৮ জুনের নিউজ উইক পত্রিকা রেভারেণ্ড জন হেস্টিংস নামক একজন মেথডিস্ট মিশনারীর উক্তি উদ্ধৃত করেছে এভাবে—'আমি নিশ্চিত, সৈন্যরা মেয়েদের ক্রমাগত ধর্ষণ করেছে ও শেষে দুই পায়ের মধ্য দিয়ে বেয়োনেট চালিয়ে তাদের হত্যা করেছে। যশোরের এক পল্লীতে জোহরা নামের এক হতভাগীরও এই পরিণতি ঘটেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি 'বাংলাদেশ : থ্রু লেন্স' শীর্ষক যে আলোকচিত্রমালা প্রকাশ করেছে সেখানে জোহরা নাম্নী এক মহিলার মর্মস্পর্শী পরিণতির ছবি গ্রথিত হয়েছে ; সৈন্যরা ধর্ষণ করার পর তাকে হত্যা করেছে, শিয়াল কুকুর তার দেহ ভক্ষণ করছে অবশেষে।' নিউজ উইকের সাংবাদিক টনি ক্লিফটন মন্তব্য করেছেন : যে কেউ ক্যাম্পে বা হাসপাতালে গেলে বিশ্বাস করবে যে, পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী যে-কোনো অত্যাচার করতে সক্ষম। আমি গুলী করে হত্যা করা হয়েছে এমন বহু শিশু দেখেছি। বেত মেরে পিঠ একেবারে রক্তাক্ত করে দেয়া হয়েছে তাও দেখেছি। চোখের সামনে নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করা হয়েছে বা নিজের মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার

হয়েছে—এসব দেখে একেবারেই মূক হয়ে গেছেন এমন বহু লোকই আমি দেখেছি। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানে শত শত মাইলাই ও লিডিসেস অনুষ্ঠিত হয়েছে।"
বাঙালি মেয়েদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার আলবদর আলশামস-এর সদস্যরা যে নির্মম পাশবিকতায় ধর্ষণ ও নির্যাতন চালিয়েছে তার যথাযথ বর্ণনা কারো পক্ষেই লেখা সম্ভব নয়।
নারী ধর্ষণকে সমর্থন করে এ কোন ইসলাম?
শিশুহত্যা জায়েজ মনে করে এ কোন ইসলাম?

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমাণ্ড

যুদ্ধে যুদ্ধে কেটে গেলো রক্তাক্ত নয়টি মাস। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় পূর্বাঞ্চল কমাণ্ডের লেঃ জগজিৎ সিং অরোরার অধিনায়কত্বে গঠিত হলো বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত কমাণ্ড। ৩ ডিসেম্বর থেকেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সংগে একাত্মতা ঘোষণা করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।
টানা ৯ মাসব্যাপী বাংলাদেশের দুর্জয় সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার খেতে খেতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন আতংকে দিশেহারা, তখন মুক্তিবাহিনীর সংগে ভারতীয় মিত্র-বাহিনীর একাত্মতায় তারা আরো মুষড়ে পড়লো। মিত্র-বাহিনীর বিমান হামলায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অবশেষে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো।

রক্তে কেনা স্বাধীনতা

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
স্বাধীনতার বিজয় সূর্য উদিত হলো বাংলাদেশের আকাশে।
১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স মাঠে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল এ. এ. কে নিয়াজী ৯১ হাজার ৫ শত ৪৯ জন সৈন্যসহ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।
৩০ লক্ষ প্রাণ, আর এক নদী রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ অর্জন করলো স্বাধীনতা। বিশ্ব-মানচিত্রে সম্মানজনক ঠাঁই করে নিলো 'বাংলাদেশ' নামের একটি

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন পরাজিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সেনাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি। পাশে মিত্র বাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা

নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূ-খণ্ড। বিশ্ববাসীর কাছে লড়াকু এবং বিজয়ী জাতি হিশেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো বাঙালি।

স্বাধীন বাংলার আকাশে বাতাসে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, অনুরণিত হচ্ছে—বিজয় এবং শোকের অর্ঘ্য—এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যাঁরা, আমরা তোমাদের ভুলবোনা........।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ঃ ওসমানীর ভাষ্য

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি কর্ণেল আতাউল গণি ওসমানীর একটি ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিলো দৈনিক বাংলায়, ১৯৭২ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা সেই সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেছিলেন সেনাপতি ওসমানী। বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক হেদায়েত হোসাইন মোরশেদকে দেয়া সেই সাক্ষাৎকারে ওসমানী বলেছেন—

.....২৬ মার্চ থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ এবং বাঙালি দমনে শত্রুদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর বাঙালি সৈনিক, প্রাক্তন ইপিআরের বীর বাঙালিরা এবং আনসার, মুজাহিদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর জওয়ানেরা। সঙ্গে সঙ্গে এদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিল যুবক ও ছাত্ররা। সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালু থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আবদ্ধ রাখা এবং যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ তাকে কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এজন্যে পদ্ধতি ছিল—যত বেশি বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে, যেসব ন্যাচারাল অবস্ট্রাকল বা প্রতিবন্ধক রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে এবং এর সাথে সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে ও যোগাযোগের পথে আঘাত হানতে হবে। মূলতঃ এই পদ্ধতি ছিল নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতি। আর সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। এই পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয়েছে। যথা ঃ ভৈরব-আশুগঞ্জের যুদ্ধ, এই যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটেলিয়নের বিরুদ্ধে শত্রু বাহিনী পুরো দুটো ব্রিগেড নিয়োগ করে। এখানে শত্রুবাহিনীকে চারদিন আটকে রাখা হয়।

তবে একটা বিষয়ে আমি আলোকপাত করতে চাই। নিয়মিত বাহিনীর যেটা স্বাভাবিক কৌশল তা আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্য কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমরা ছোট ছোট অংশ অর্থাৎ ছোট ছোট পেট্রল বা ছোট ছোট কোম্পানীর প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রুবাহিনীর তুলনামূলক অধিক সংখ্যক লোককে রুদ্ধ করে রাখি এবং সাথে সাথে শত্রুর ওপর আঘাতও হানতে থাকি। এভাবে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে সর্বপ্রথমে যুদ্ধ শুরু হয়।

সে সময় আমি ও আমার অধিনায়কদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমরা কেবলমাত্র নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে চলতে পারব না। কারণ আমাদের সংখ্যা তখন সর্বমোট মাত্র ৫টি ব্যাটেলিয়ান। এছাড়া আমাদের সাথে প্রাক্তন ইপিআরের বাঙালি জওয়ানরা, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও যুবকরাও ছিলেন। যুবকদের অস্ত্র দেয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমরা ভেতর থেকে যে অস্ত্রগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে তাদেরকে তাড়াতাড়ি মোটামুটি প্রশিক্ষণ দিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে তখন শত্রুবাহিনীর ছিল তিন-চারটি ডিভিশন। এই তিনটি ডিভিশনকেই নিম্নতম সংখ্যা হিশেবে ধরে নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে এদেরকে প্রতিরোধ করা, ধ্বংস করা সোজা নয়, সম্ভবও নয়। তাই এপ্রিল মাস নাগাদ এটি আমার কাছে পরিষ্কার ছিল যে আমাদের একটি গণবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই গণবাহিনী শত্রুপক্ষের সংখ্যার গরিষ্ঠতাকে নিউট্রেলাইজ করবে।

কিন্তু এর সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার ছিল যে বইয়ে লেখা ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যেই আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্যে আমার অনেক নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের কথা আমি মে মাসের শুরুতে সরকারকে লিখিতভাবে জানাই। এবং এই ভিত্তিতে মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্যও চাই। তাতে আমার উদ্দেশ্য ছিল (ক) কমপক্ষে ৬০ থেকে ৮০ হাজার গেরিলা সমন্বিত বাহিনী (খ) ২৫ হাজারের মতো নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী সত্বর গড়ে তুলতে হবে। কারণ একদিকে গেরিলা পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডো ধরনের রণকৌশল দিয়ে শক্তিকে বন্টন করার জন্যে বাধ্য করতে হবে যাতে তার শক্তি হ্রাস পায়।

এই পদ্ধতি আমরা কার্যে পরিণত করি। ক্রমশঃ গড়ে উঠল একটি বিরাট গণবাহিনী—গেরিলাবাহিনী। জুন মাসের শেষের দিক থেকে গেরিলাদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি বানানো হয় এবং জুন মাসের শেষের দিক থেকে আমাদের গণবাহিনী বা গেরিলাবাহিনী এ্যাকশনে নামে। তবে, জুলাই আগস্ট মাসের আগ পর্যন্ত শত্রুবাহিনী তাদের ওপর গেরিলাবাহিনীর প্রবল চাপ বুঝতে পারে নি। যদিও শুরু থেকে আমরা কিছুসংখ্যক যুবককে ট্রেনিং দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছিলাম। তারা চট্টগ্রাম বন্দরেও গিয়েছিল, ঢাকায়ও এসেছিল। তবে গেরিলাদেরকে শত্রুরা জুলাই মাস থেকে অনুভব করতে শুরু করে।

আমাদের নৌবাহিনী ছিল না। আমার কাছে নিয়মিত নৌবাহিনীর বহু অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার ও নাবিক আসেন। ফ্রান্সের মতো জায়গা থেকে কয়েকজন পাকিস্তানের ডুবোজাহাজ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। আমি তাদেরকে ভিত্তি করে এবং আমাদের বড় শক্তি–যুবশক্তিকে ব্যবহার করে নৌ–কম্যান্ডো গঠন করি। এই নৌ–কম্যান্ডো জলপথে শত্রুর চলাচল ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে আমাদের এই নৌ–কম্যান্ডোদের আক্রমণ শুরু হয়। তারা যে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই। তারা মংলায় বহু জাহাজ ডুবায়। তারা শত্রুর জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র ও কামান নিয়ে যেসব জাহাজ আসছিল চট্টগ্রামে সেগুলো ধ্বংস করে। এজন্যে অত্যন্ত দুঃসাহসের প্রয়োজন ছিল। তারা শত্রুর দুটো বন্দর অচল করে দেয় এবং নদীপথেও তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়।

.... আমার কাছে বিমান ছিল না। তবে শেষের দিকে কয়েকটি বিমান নিয়ে আমি ছোটখাটো একটি বিমানবাহিনী গঠন করেছিলাম। আমি যে বিমান পেয়েছিলাম তা ছিল দুটো হেলিকপ্টার, একটি অটার এবং আমার যানবাহনস্বরূপ একটি ডাকোটা। সেই অটার ও হেলিকপ্টারগুলোতে মেশিনগান লাগিয়ে যথেষ্ট সজ্জিত করা হলো। আমাদের যেসব বৈমানিক স্থলযুদ্ধে রত ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে একটি ছোট বিমানবাহিনী গঠন করা হলো। এই বাহিনীর কৌশল ছিল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটিতে হামলা করা এবং ইন্টারডিকশন অর্থাৎ শত্রুর যোগাযোগের পথকে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানা। শত্রুর ওপর প্রথম যে বিমান হামলা হয়েছে তা বাংলাদেশের বীর বৈমানিকেরা করেছে। ২৬ মার্চ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ হয়েছে তাতে যদিও আমাদের কাছে বিমান ছিল না কিন্তু আমরা বিমানঘাঁটিগুলোতে আঘাত হেনেছি। শেষের দিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা সিলেট বিমানঘাঁটিতে একটি সি–১৩০ বিমানের ওপরও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মেশিনগান চালায়। মেশিনগানের গুলীতে যদিও সি–১৩০ বিমানটি পড়ে যায় নি, তবে কোনরকম টুল টুলু করে চলে গিয়ে শমসেরনগরে নেমেছিল এবং পরে অনেকদিন মেরামতিতে ছিল। ....

শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বরের আগে শেষ পর্যায়ে শত্রুবাহিনী ভারতের ওপর যথেষ্ট পরিমাণ হামলা শুরু করল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে ভারতীয়দের যুদ্ধে .....নামতে হবে। ..... ভারতীয় বাহিনী ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধে নামে। এবং শত্রু আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ১৩ দিন যুদ্ধ করেছিল। অবশ্য এর আগে তাঁরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর যখন যুদ্ধে নেমে আসার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন আমরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করে একটি রণনীতি অবলম্বন করি। যেহেতু ভারতীয়দের কাছে ট্যাংক, কামান ও বিমান রয়েছে সেজন্যে যেখানে অধিক শক্তিশালী প্রতিরোধ রয়েছে এবং বড় অস্ত্র–শক্তি প্রয়োজন সেখানে তারা প্রথম লক্ষ্য দেবেন এবং আমাদের বাহিনী শত্রুকে 'আউটফ্ল্যাংক' অর্থাৎ শত্রুকে দুপাশ দিয়ে অতিক্রম করে 'ক্রস কান্ট্রি' দিয়ে গিয়ে ব্যূহের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করবে অথবা ভারতীয়রা সামনের দিকে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে এবং আমাদের বাহিনী 'আউটফ্ল্যাংক' করে পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে। ...

আমাদের বাহিনী যেসব অঞ্চল এভাবে মুক্ত করে তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট অঞ্চল, সিলেটের সুনামগঞ্জ ও ছাতক অঞ্চল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরাঞ্চল, চট্টগ্রামের করেরহাট, রামগড়, হাটহাজারী অঞ্চলের 'এক্সেস অব এডভান্স,' কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চল, যশোরের মণিরামপুর ও অভয়নগর অঞ্চল, খুলনার বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কালিগঞ্জ অঞ্চল, ফরিদপুর সদর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং ঢাকা পৌঁছার শেষ পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী–ঢাকায় এই 'এক্সেস অব এডভান্স' হয়েছে।

অভ্যন্তরভাগের গেরিলাদের (গণবাহিনীর) সাথে আমাদের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণের সামঞ্জস্য বিধান করা হত। নির্দেশ থাকত গেরিলারা অমুক অমুক জায়গায় আক্রমণ করবে, শত্রুর দৃষ্টিকে অন্যদিকে ধাবিত করতে হবে এবং শত্রুর যাতে গোলাবারুদ ও রিইনফোর্সমেন্ট না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। গেরিলারা অমুক জায়গায় অমুক পুলটি উড়াবেন। তবে আমরা বড় বড় পুলগুলোতে হাত দেইনি। সেই পুলগুলো শত্রুরাই আত্মসমর্পণের আগে ভেঙেছিল।

বাংলাদেশকে আমি ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলাম। এগারটি সেক্টর একেকজন অধিনায়কের অধীনে ছিল এবং প্রত্যেক অধিনায়কের একটি সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল। এই সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলো বাংলাদেশের ভেতরেই ছিল। এই সেক্টরগুলো ভিত্তি করেই আমি যুদ্ধটি লড়েছি। আমার ছিল মাত্র ১০ জন অফিসারবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনীর রণপরিচালনার হেডকোয়ার্টার। ... প্রতিটি সেক্টর কমাণ্ডারের স্থানীয়ভাবে তাঁদের দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে আমি লিয়াজোঁ অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এছাড়া আমার কমাণ্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে যেতাম অন্য সেক্টরে। সে অবস্থায় আমি যখন যে যে সেক্টরে থাকতাম সে সেক্টরের হেডকোয়ার্টারই হত আমার হেডকোয়ার্টার। ....
যখন বাংলাদেশ সরকার আমাকে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন তখন আমি তাঁদের অনুমোদনক্রমে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম এ রবকে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করি। তিনি আমার পরে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন। ... বিভিন্ন সেক্টরের কমাণ্ডারগণ হচ্ছেন—এক নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিক। দুই নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ, পরে মেজর হায়দার।তিন নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর শফিউল্লাহ, পরে মেজর নূরুজ্জামান। চার নম্বর সেক্টরে মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। পাঁচ নম্বর সেক্টরে মেজর মীর শওকত আলী। ছয় নম্বর সেক্টরে উইং কমাণ্ডার বাশার। সাত নম্বর সেক্টরে মেজর কাজী নূরুজ্জামান। আট নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর ওসমান চৌধুরী, আগস্ট মাস থেকে মেজর মঞ্জুর। নয় নম্বর সেক্টরে মেজর জলিল। দশ নম্বর সেক্টরে মেজর জয়নাল আবেদিন (অসমর্থিত)। এগার নম্বর সেক্টরে মেজর আবু তাহের। জেড ফোর্স (জিয়া বাহিনী)–মেজর জিয়াউর রহমান। কে ফোর্স (খালেদ বাহিনী)–মেজর খালেদ মোশাররফ, তিনি আহত হলে মেজর আবু সালেক চৌধুরী। এস ফোর্স (শফিউল্লাহ বাহিনী)–মেজর শফিউল্লাহ।

...... যুদ্ধের শুরুতে খুব তাড়াতাড়ি একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব মনে হত না। কিন্তু আমার মুক্তিবাহিনীর সৈনিক, নিয়মিত বাহিনীর অফিসার ও অধিনায়কদের চেষ্টায় আমি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি–বাইশ হাজার সৈন্য সম্বলিত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলেছিলাম। তারা সাধারণ ইনফ্যান্ট্রি অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। দুটো গোলন্দাজ ব্যাটারী আমরা গড়ে তুলেছিলাম। ভারতীয়দের প্রাচীন কিছু কামান ছিল। এগুলো দিয়ে প্রথম ব্যাটারীটি গড়ে উঠেছিল, এর নাম দিয়েছিলাম—'নম্বর ওয়ান মুজিব ব্যাটারী।' এই ব্যাটারী যুদ্ধেই ছিল। এর পর আমরা দ্বিতীয় ব্যাটারী গঠন করি। আগেরটির চেয়ে একটু ভাল কামান দিয়ে এটি সজ্জিত ছিল। এ ব্যাটারীও যুদ্ধ করে। ...

আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করি প্রায় ৫ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য দিয়ে। যুদ্ধের শুরুতেই অনেকগুলোর সংখ্যা পূরণ করতে হয়েছে। যেমন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ান। এটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পুরনো পল্টন। মাত্র ১৮৮ জনকে আমি পেয়েছিলাম। বাকিরা নিহত কিংবা আহত হয়েছিলেন যশোরের যুদ্ধে। তাদের সংখ্যা পূরণ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমি ৫টি ব্যাটেলিয়ান থেকে ৮টি ব্যাটেলিয়ানে উন্নীত করি। এগুলো ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক, দুই, তিন,

চার, আট, নয়, দশ, এগার নং ব্যাটেলিয়ান। নয়, দশ, এগার ছিল নতুন।

এছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তুলি। সেক্টর ট্রুপস–এর সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ছিল দশ হাজার। যারা প্রাক্তন ইপিআর এবং নিয়মিত বাহিনীর বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে এসেছিলেন তাদেরকে ১১টি সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর ট্রুপস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। কোনো সেক্টরে চার কোম্পানী, কোনো সেক্টরে পাঁচটি কোম্পানী, কোনো সেক্টরে ছয়টি কোম্পানী, এমনি বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন অনুসারে সংখ্যা বিভিন্ন ছিল। তারা সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে যুদ্ধ করতেন। নিয়মিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটেলিয়ান দিয়ে গঠিত হয়েছিল ব্রিগেড। ব্রিগেডগুলো আমি 'ফোর্স' নাম দিয়েছিলাম। ব্রিগেডগুলোর কমাণ্ডারদের নামে এই নামকরণ করা হয়েছিল। ... ...

অস্ত্র ছিল, যা স্বাভাবিক ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ানে থাকে—গ্রেনেড, রাইফেল, লাইট মেশিনগান, মিডিয়াম মেশিনগান, দুই ইঞ্চি এবং তিন ইঞ্চি বা ৮১ মিলিমিটার মর্টার এবং ট্যাংক বিধ্বংসী কামান।

প্রায় ৮০ হাজারের মতো ছিল গণবাহিনী সদস্য। আমি ৬০ থেকে ৭০ হাজার গণবাহিনী কাজে নিয়োগ করেছিলাম। এছাড়া কয়েক হাজার প্রশিক্ষণরত ছিল। ... ... গণবাহিনীর বীর গেরিলাদের অস্ত্র ছিল প্রত্যেকের কাছে গ্রেনেড, কয়েকজনের কাছে স্টেনগান। এছাড়া ছিল রাইফেল ... ... এছাড়া ছিল অল্প কয়েকটি পিস্তল ও এসএলআর। .. .. এছাড়া বিভিন্ন নির্দিষ্ট অপারেশনের জন্যে থাকত বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক। নৌ–কমাণ্ডারদের জন্যে হাল্কা অস্ত্র থাকত, বেশিরভাগ সময়ই গ্রেনেড। আর থাকতো অপারেশনের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন লিম্পেট মাইন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার সৈন্যসংখ্যা ছিল— কুড়ি পঁচিশ হাজার নিয়মিত বাহিনী এবং সত্তর আশি হাজার গণবাহিনী।
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নাম ছিল মুক্তিবাহিনী। এর ভেতর স্থল, জল, বিমান তিনটিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ... ... বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পুরোটা মিলিয়ে ছিল মুক্তিবাহিনী। এর দুটো অংশ ছিল। (১) নিয়মিত বাহিনী (২) গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী। ... ... শুরুতে গেরিলাদের দু'সপ্তাহের ট্রেনিং দেয়া হতো। কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। পরে মেয়াদ খানিকটা বাড়ানো হল, তখন তিন সপ্তাহের মতো সাধারণ গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হত। এছাড়া আমি কিছুসংখ্যক গেরিলার জন্যে একটি বিশেষ কোর্সের বন্দোবস্ত করেছিলাম। একে বলা হত স্পেশাল কোর্স। এটা ছয় সপ্তাহের ছিল। এই কোর্সে গেরিলা লিডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এবং আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার অর্থাৎ শহর অঞ্চলে আবাসিক এলাকায় যুদ্ধ করার পদ্ধতিও তাদের শেখানো হতো। এদের ভূমিকা ছিল গেরিলাদের নায়কত্ব করা। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল খুব কম। চাকুলিয়া নামে এক জায়গায় তাদের ট্রেনিং দেয়া হত। এসব গেরিলা বিশেষভাবে সিলেক্ট হয়ে যেত। এবং এদের সিলেকশনের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি লোক নিয়োগ করেছিলাম। তাই এদের নাম কেউ কেউ বলত সিইনসি স্পেশাল : আসলে এ নামে কোন স্বতন্ত্র বাহিনী ছিল না।

এ এ কে নিয়াজী

গোলাম আযম

জুলফিকার আলী ভুট্টো

স্বাধীনতার উষালগ্নে

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে স্বাধীনতার উষালগ্নে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা–বিরোধীদের পরাজয় যখন সুনিশ্চিত, তখন ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর—রাজাকার আলবদর আলশামস বাহিনী দেশের নৃশংসভাবে হত্যা করে বুদ্ধিজীবীদের। অধ্যাপক চিকিৎসক সাংবাদিক শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক চিন্তাবিদ—দেশের সেরা সন্তানদের হত্যা করেছিলো ওরা নির্মম পৈশাচিকতায়। এই ঘৃণ্য রাজাকার আলবদরদের নেপথ্য নায়ক ছিলেন গোলাম আযম (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামের আমীর)। বাঙালি নামের কলঙ্ক এই গোলাম আযমের অনুসারীরাই পাকিস্তানী নরপশুদের হাতে তুলে দিয়েছে এদেশের শতসহস্র মা বোনদের।
মুসলিম লীগ আর জামায়াতে ইসলামের সদস্যরা গঠন করেছিলো রাজাকার আলবদর আর আলশামস বাহিনী। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গঠন করেছিলো শান্তিকমিটি। ইসলামের ধ্বজাধারী শান্তিকমিটির সদস্যরা ইসলাম ধর্ম রক্ষার ফতোয়া দিয়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে মেতে উঠেছিলো নির্মম হত্যাযজ্ঞে। বাঙালি এবং বাংলা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্যে তারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলো। অবশ্য বুদ্ধিজীবী নিধনের এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো ২৫ মার্চ রাত থেকেই। ডঃ গোবিন্দ চন্দ্রদেব, শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাসহ অনেকেই শিকার হয়েছেন হানাদার বাহিনীর। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কারফিউর মধ্যে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে তালিকা অনুযায়ী খুঁজে খুঁজে একজন একজন করে বুদ্ধিজীবীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো রাজাকার আলবদররা। তারপর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে এবং মিরপুরে অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো তাঁদের।

গোবিন্দ চন্দ্র দেব

মুনীর চৌধুরী

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা   আবুল খায়ের   আনোয়ার পাশা

স্বাধীনতার সূর্যটি যখন পূর্বদিগন্তে উদয় হবার আয়োজন করছে, ঠিক তখনই স্বাধীনতা বিরোধীদের ঘৃণ্য তৎপরতায় জীবন দিতে হলো বুদ্ধিজীবীদের।

হারিয়ে গেলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সাংবাদিক শহিদুল্লাহ্ কায়সার, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, চিকিৎসক ফজলে রাব্বি, চিকিৎসক আলীম চৌধুরী, চিকিৎসক মোহাম্মদ মোর্তজা, সাংবাদিক আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শিক্ষাবিদ আবুল খায়ের, অধ্যাপক আনোয়ার পাশাসহ আরো অনেকে।

প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে পালন করা হয় 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস'।

৬.৪.১৯৭১ : বেলুচিস্তানের কসাই টিক্কা খানের সঙ্গে বৈঠক করছেন নুরুল আমিন এবং ঘাতকবাহিনীর দোসর গোলাম আযম। এই বৈঠকেই শান্তি কমিটি গঠনের সূত্রপাত ঘটে

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন বঙ্গবন্ধু ; থৈ থৈ জনসমুদ্র ; সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ; মুক্তস্বাধীন প্রিয় স্বদেশভূমিতে

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

কিন্তু এদেশের মানুষের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনো পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। ২৫ মার্চের পর থেকে শেখ মুজিবকে কাটাতে হয়েছে পাকিস্তানের কারাগারে। অন্তরীণ অবস্থায় সামরিক আইনে তাঁর বিচার এবং সাজার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে। ফাঁসির হুকুম হয়েছিলো তাঁর। কবরও খোঁড়া হয়েছিলো। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লণ্ডন ও দিল্লী হয়ে ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচে বরেণ্য বিজয়ী রাজপুত্রের মতো প্রত্যাবর্তন করলেন বঙ্গবন্ধু ; মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে। তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে।

বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু সরাসরি চলে আসেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। যেখানে অপেক্ষা করছিলো তাঁর জন্যে লাখো মানুষের জনসমুদ্র। ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, যেখানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ আরেকটি জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে

সম্মোহনী কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ফিরে এলেন সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, যেখানে আত্মসমর্পণ করেছে পাকিস্তানী হায়েনারা।

থই থই জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত বঙ্গবন্ধু বললেন, '......আমি জানতাম না আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারবো। আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মারতে চাও মেরে ফেলো। শুধু আমার লাশটা বাংলাদেশে আমার বাঙালিদের কাছে ফিরিয়ে দিও......। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিলো। জীবন দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বলেছিলাম আমি বাঙালি। আমি মানুষ। আমি মুসলমান। মানুষ একবারই মরে ; হাসতে হাসতে মরবো, তবু ওদের কাছে ক্ষমা চাইবো না। মরার আগে বলে যাবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার মা।......নম নম নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি।'

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ; দলিলপত্র ; সম্পাদনা/হাসান হাফিজুর রহমান
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ/ডঃ রফিকুল ইসলাম
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম/ডঃ রফিকুল ইসলাম
উইটনেস টু সারেণ্ডার/সিদ্দিক সালিক (অনুবাদ: মাসুদুল হক)
বাংলাদেশ গড়লো যাঁরা/সিরাজউদ্দীন আহমেদ
আমি বিজয় দেখেছি/এম. আর. আখতার মুকুল
পাকিস্তানের চব্বিশ বছর ; ভাসানী মুজিবের রাজনীতি/এম. আর. আখতার মুকুল
একুশের দলিল/এম. আর. আখতার মুকুল
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম/পাভেল হক
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ/ রাজেন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ; বিশ্বের ইতিহাস/ডঃ মোহাম্মদ হান্নান
মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর/ শামসুল হুদা চৌধুরী
রক্তাক্ত বাংলা/মুক্তধারার সঙ্কলন
বাংলাদেশের অগ্নিকিশোর/লুৎফর রহমান রিটন